বিরল চেতনা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

রাত থেকেই নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করছে কান্তা । চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করেছে সারারাত, লাভ হয় নি। রাতে ঘুম না হলে যা হয় তাই হল, চেখে বিরক্তি গায়ে অসাড়তা আর মুখে অরুচি নিয়ে বিছানা ত্যাগ করতে হল ওকে । জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল । বাইরে রোদ ঝলমলে সকাল । প্রকৃতিটাকে নিজের অনুকূলে না পেয়ে ওর বিরক্তির মাত্রা বেড়ে গেল । ভাবে, বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি বা ঝড় হাওয়া গোছের কিছু হলে দুঃখটাকে জানালায় চোখ দিয়ে মন ভরে উপভোগ করা যেত ।

ওর মা ডাকছে, " কান্তা উঠেছিস মা । ঘর গুছিয়ে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আয়, নাস্তা কর । তোর ছোট মামা ফোন করেছিল। এই এসে পড়লো বোধহয় ।" এই অসময়ে অফিস ছেড়ে ছোটমামা কেন আসছে সেটা কান্তা আঁচ করতে পারে । কান্তার বাবা নেই । সংসারে মা বাদে এই একটা মানুষের কথা সে পারত:পক্ষে মনোযোগ দিয়ে শোনে । স্নেহ মমতা এক তরফাভাবে শুধু গ্রহণ করে মামার কাছে ওর নিজের ঋণ জমেছে অনেক । কান্তা ভাবে, " ভাগ্যিস এই ঋণের কোন সুদ নেই । এমনকি আসলটাও কখনও ফিরিয়ে দিতে হয় না।" ও জানে ছোটমামা এসে ওকে বোঝাবে, "পাগলামি করিস না । সাগরকে এভাবে না করে দিস না। তোদের এত দিনের ঘনিষ্ঠতা দেখেতো ওটাকে খাঁটি ভালবাসাই মনে হত ।"

বেল বাজলে দরজাটা কান্তাই খুলে দিল । মামার সামনে সাধ্যমত নিজেকে গুছিয়ে স্বাভা্বিক হওয়ার চেষ্টা করলেও ওর চোখের কোনায় জমা কালি দেখে মামা বলে, "

মামনি এত চিন্তা ভাবনা করলে কি চলে । নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অনেক সময় পাবি । কিরে তোর মুরুব্বির দায়িত্বটা আমার ভারি লাগছে আমার আচরণে সেরকম কখনও মনে হয়েছে তোর ?"

" আমি কখনও সেটা বলেছি মামা ?"

" উচ্চ শিক্ষার্থে ছেলেটা বিদেশে যাচ্ছে । যাকে মন দিয়ে এত চাস, তার এরকম একটা আনন্দের খবরে তোরই তো সবচেয়ে বেশী খুশী হওয়ার কথা ।"

" খুশী হয়েছি মামা, তবে আনন্দ করতে পারছি না ।"

" কেন পারছিস না ?"

" তুমি বুকে হাত রেখে বল দেখি মামা, আমি যদি বাইরে চলে যাই মা সত্যি তাড়াতাড়ি মরে যাবে না ।"

" একি বলছিস মা, জীবন মৃত্যুর হিসেবটা কি মানুষের জানা আছে । তুই চলে গেলে তোর মা-র একাকিত্বটা যে বাড়বে সেটা সত্যি তবে মেয়ের সুখের জন্য সেটা উনি ঠিকই মেনে নিতে পারবে ।"

মামার যুক্তিটাকে কান্তা মেনে নেয় না । ওর ছোটমামাও বোঝাবার জন্য ঘন্টা খানেক চেষ্টা করে অফিসে চলে যায় । যাবার সময় দরজার কাছে ওর মা-র সামনেই বলে, " তোর মত পাল্টালে আমাকে না বলতে পারিস আপাকে বলিস, আজকের মধ্যেই বলিস কিন্তু । সাগরের ফ্লাইট তিন দিন পরে, ও বেচারা চাচ্ছে কালকের মধ্যেই পানচিনিটা সেরে ফেলতে ।"

ছোটমামা চলে গেলে, ওর মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, " রকিবটাও ফেল করলো । এই পাগলীকে এখন বোঝাবে কে ।"

কান্তা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয় । বালিশটা বুকে চেপে ধরে, বুঝতে পারে পাশের রুমে মা টেলিফোনে কারও সাথে উঁচু শব্দ করে কথা বলছে । ওকে নিয়ে যে কথা হচ্ছে শুধু এটুকু বোঝে । বিষয় বস্তু বোঝার মত মনোযোগ দেয়ার মন তার নেই । মা ওকে গতরাতে অনেকক্ষণ বোঝাতে চেষ্টা করেছে, বলেছে সাগর হয়তো ওকে বলেছিল বাংলাদেশ ছেড়ে কখনো যাবে না, তবে এত ভাল একটা সুযোগ হাতছাড়া করাতো ওর উচিত না । আমেরিকার একটা ভাল স্কুল থেকে রিসার্চ এ্যাসিসটেন্টশীপ পেয়েছে সাগর । কান্তা ঠান্ডা গলায় মাকে জানিয়ে দিয়েছে, " বিদেশ যাওয়ার সুযোগটা ওকে হাতছাড়া করতে হবে । সাগরের সাথে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার আগে আমার সংকল্পটা সম্বন্ধে ওকে বারবার সাবধান করেছি । ভেবে চিন্তে মত দিল, মেলামেশা করলো তারপর বিদেশ যাওয়ার সুযোগ এলে আমাদের সন্ধির শর্তটা বেমালুম তুচ্ছ হয়ে গেল !"

ওর মা নাছোড় বান্দার মত হাল ছাড়ে না, বলে, "পরিচয় প্রেমে গড়ানোর সময় ছেলেমেয়েরা এরকম প্রতিজ্ঞা করেই থাকে। সময়ে অসময়ে দুজনকেই ছাড় দিতে হয় ।"

কান্তা মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, " মা আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতো অথবা আমার আর কোন ভাইবোন থাকতো তাহলে তোমাকে এত করে বোঝাতে হত না ।

বাবার কথা বলতেই ওর মা উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । কান্তা বোঝে ওর মা শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছছে । কান্তা জানে নিঃশব্দের কান্না সবসময় বেশী অর্থবহ হয় । মানুষ মুখ বুজে যখন চোখের জল ফেলে তখন তার বুকে জেগে ওঠা না বলা কথায় সবসময় স্মৃতি বিজড়িত কোন গল্প লুকিয়ে থাকে । ওর মার দুঃখ জাগানিয়া গল্পটা ওর অজানা নয় কারন সে নিজেও সেই গল্পের একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র । মা কান্না চেপে ওর দিকে ঘুরে কষ্ট করে হেসে বলে, "পাগলী মেয়ে আমার, তুই সুখে থাকলে তোর বাবার আত্মাটাইতো সব চাইতে বেশী শান্তি পাবে । আমার কাছে রেখে যাওয়া তোর বাবার সবচেয়ে বড় সম্পদ তুই, তোর অযত্ন হবে এটা আমি সইতে পারবো না মা । সাগরকে যতটুকু জেনেছি আমার মনে হয় ও তোর কখনই অবহেলা করবে না ।"

মায়ের চোখে সরাসরি চোখ রাখে কান্তা, " মা, বাবার উপর তোমার বড় অভিমান তাই না ?"

" কেনরে ?"

" এই যে তোমাকে একা ফেলে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ।"

" যে মানুষ চিরদিনের জন্য চলে গ্যাছে তার সাথে আর অভিমান করে কি লাভ । ইচ্ছে থাকলেও তো সে আর বলার সুযোগ পায়নি যে ওর আরও অনেকদিন বাঁচার ইচ্ছে ছিল ।" একটু থেমে আবার বলে, " ও হয়তো ওপারে যেয়েও বলছে, সংসারের বৈচিত্র্যময় পথটা একসাথে পাড়ি দেব বলে সাথী হয়েছিলাম, দুঃখ আজ নিজের ইচ্ছের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেললাম ।"

ওর মা নিজের ভাবনায় আত্মসমর্পন করে কিছুক্ষণের জন্য, একটু পরে কান্তাকে বলে, " আমি নিজেকে মাঝে মাঝে সবচেয়ে ভাগ্যবতী ভাবি কেন বলতো ?" কান্তার উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে, " তোর বাবার মত মানুষকে আট বছরের জন্য হলেও কাছে পেয়েছিলাম বলে। মাঝে মাঝে আবার নিজেকে ভাগ্যহতা ভাবী কেন জানিস ?"

" জানি," কান্তা বলে, "মানুষটাকে ধরে রাখতে পারলেনা বলে ।" বাবার স্মৃতি মা যে অত্যন্ত যত্ন করে বয়ে নিয়ে বেড়ায় এটা সে জানে । মাকে সহজ করার জন্য বলে, "বাবাতো তোমাকে খালি হাতে রেখে যায়নি মা । আমার মত সুস্থ, সুন্দর, বুদ্ধিমতী এবং বিশ্বস্ত একটা মেয়েকে ঘুষ হিসেবে দিয়ে গেছে ।"

" তুই কি আর চিরদিনের জন্য মায়ের ঘরে থাকবি ?"

" জ্বী থাকবো । আর এজন্যই বলছি সাগরের সাথে বিয়ে করে তোমাকে একা ফেলে আমি বিদেশে যেয়ে থাকতে পারবো না। সবকিছু আমাকে যত্ন করে শিখিয়েছো মা শুধু একটা জিনিস ছাড়া ।"

" কি সেটা ?"

" স্বার্থপরতা ।"

" মেয়ে হয়ে জন্মেছিস । বড় হলে শ্বশুর বাড়ি চলে যাবি, এটাই তো আমাদের সমাজের সোজা হিসেব ।

" মেয়েরা বাংলাদেশেও মা আর শ্বশুর বাড়ী যায় না, যায় স্বামীর বাড়ী ।"

" তুই কি ভেবেছিস দেশে থাকলে সাগর আমাদের এখানে এসে ঘরজামাই হয়ে থাকতো আর তুই স্বামী আর মা দুজনকে মন ভরে আদর যত্ন করতিস ?"

" সাগর ওরকম ছেলে না মা । ওকে আমি যতটুকু বুঝেছি ওর আত্মসম্মান কখনই ওকে ঘর জামাই সাজতে দিতো না । আমি জানি তোমার কাছাকাছি থাকলে বুড়ো বয়সে তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনিয়ম করতে পারবে না ।"

" হয়েছে আর মুরুব্বীগিরি করতে হবে না । বলি কি, এতই যখন ছেলেটাকে বুঝেছিস, ওর এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অবুঝের মত করছিস কেন ? যা ফোন করে ওকে হ্যাঁ বলে দে, আমি তোর ছোটমামাকে ডাকি; পানচিনির ব্যাপার হলেও আমাদের একটু প্রস্তুতির দরকার আছে না ?"

কান্তার মা মনে করেছিল মেয়ে অনেকক্ষণ ঠান্ডা মাথায় ওর সাথে কথা বলছে যখন এবার বোধহয় মেয়ের মনে বরফ গলতে শুরু করেছে । ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার আগেই দ্বিতীয় ধাক্কা এসে যেমন সব তছনছ করে দেয়, ওর মার জন্য তেমনি আকস্মিক একটা ধাক্কা আসে কান্তার কাছ থেকে । কান্তা বলে, " মা আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?"

" কি কিছুদিন সময় নিতে চাস । ঠিক আছে সাগরকে বুঝিয়ে বল ও এখন চলে যাক । বিদেশে পড়ালেখার সিস্টেম বুঝে উঠতেই শুনি দু একটা সেমিষ্টার লেগে যায় । তারপর ছুটিতে দেশে এলে, " ওর মা শেষ করতে পারে না ।

" না মা আমার অনুরোধটা হল সাগরের সাথে আমার বিয়ের ব্যাপারে আর কখনও রাজী করাতে চেষ্টা করবে না আমাকে ।"

মেয়েকে মুখ ফুটে কথা দেয় না তবে ওর মায়ের মুখটা হঠাৎ করে মলিন হয়ে যায় । চোখে ত্বরিত শাসন এনে কিছু বলতে যেয়েও না বলে রান্না ঘরে চলে যায় । রান্না ঘরে যেয়ে কাজের মেয়ে গোলাপীকে মনের সব রাগ উজাড় করে ঝেড়ে দিয়ে বলে, " রাত বাজে মাত্র নয়টা, এর মধ্যেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিস ? আর একদিন গোশতে বেশী ঝাল দিবি তো তোর বাপকে ডেকে দেশে পাঠিয়ে দেব ।"

মায়ের মেজাজের রহস্যটা কান্তা বুঝতে পেরে নিজে নিজে হাসে । রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে গোলাপী জোড়ে ট্যাপ ছেড়ে সবজি ধুচ্ছে । ঘুমতো দূরে থাক, গোলাপীর চোখে যে তেজ, রান্না সেরে তিন ঘন্টা বিটিভি দেখলেও সে তেজ ফুরাবে বলে মনে হয় না । গোলাপীও ওর মাকে অনেকদিন হলো চেনে । ওর মায়ের অহেতুক শাসনে গোলাপী বরং হেসে বলে, " আম্মা আমারে বকতাছেন । আরও বেশী কইরা বকেন । বকলে আপনারে আমার আরও বেশী নিজের মায়ের মত লাগে । সৎমায়ে আমারে কখনই বকতো না, তয় বাজানরে দিয়া বকাইতো । মা মরলে নিজের বাপও সৎ হইয়া যায় বুঝলেন ।"

কাজের মেয়ের কথায় কান্তার মা ওর কষ্টটা অনুভব করে নিজের হতাশাকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে, "গোলাপী তোর টাংগাইলের শাড়ী খুব পছন্দ বলছিলি না, যা কাল তোকে বাজারে নিয়ে যেয়ে সুন্দর একটা টাংগাইল শাড়ী কিনে দেব ।" মাকে স্বাভাবিক হতে দেখে কান্তা স্বস্তি পেয়েছিল ।

গতরাতের ঘটনাগুলোর সাথে ছোটমামার সকালে আসাটার যোগসূত্র খুঁজে পায় সে । কিন্তু ওতো নিজেকে চেনে, রাজীই যদি হতো তবে মায়ের কথাতেইতো হতো। বুকে বালিশ চেপে ধরে কান্তা, কান্না আসে না সেটা আসলে হয়তো মনটা হালকা হত ওর । বুকটার আকাশে কালো মেঘের ভীড় জমা হয়, হৃদয়ে স্মৃতির ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে, মনের জানালাটা খুলে যায় কান্তার ।

কান্তার বাবা ছিলেন পার্বতীপুর রেলের নির্বাহী প্রকৌশলী। স্টেশনের পিছনেই ওদের বাংলো ছিল । পার্বতীপুরের স্মৃতি তেমন মনে নেই কান্তার । আবছা আবছা স্মৃতি গুলো খন্ড খন্ড যেটুকু মনে পড়ে মা-র মুখে শোনা কাহিনীর সাথে মিলিয়ে সেটা কাগজে কলমে

লিখলে ভরাট একটা পাতাও হবেনা। শুধু এটুকু মনে পড়ে ওদের বাংলোর পিছনে ও সামনে বিরাট বাগান ছিল। সামনের বাগানে সার ধরে চন্দ্র মল্লিকার গাছ ছিল। মা বলেছে বাবা এমন ভাবে সাদা আর হলুদ চন্দ্র মল্লিকার গাছগুলোকে সাজিয়েছিল, ফুল ফুটলে মনে হত বাগানটা হলুদ পেড়ে সাদা শাড়ী পড়ে আছে। মা আরও বলেছে ওর বাবা বাগানের মাঝখানে পাতাবাহারের গাছ দিয়ে লিখেছিল "জবা আমার জবা"। কান্তার মার নাম জবা। ওর মনে আছে বাবার রেলের সেলুনে চড়ে ওরা প্রায়ই এখানে ওখানে বেড়াতে যেত। কান্তার পার্বতীপুরের জীবনের গল্পটা বেশী বড় হতে পারে নি, ছয় বছর বয়সে বাবা মা-র সাথে আমেরিকাতে চলে গিয়েছিল সে।

ওরা আমেরিকায় অ্যারিজোনা স্টেটের টেম্পি শহরে থাকতো। ছিমছাম সাজানো গোছানো একটা শহর যেটা দেখলেই বোঝা যায় বেরসিক কোন স্থপতির প্লান করা। বিদগ্ধ কোন শিল্পী এরকম সরলরেখার মত রাস্তা দিয়ে শহর সাজাতে পারবে না। বাবা ওর মাকে বলতো, "বুঝলে জবা টেম্পি হচ্ছে সুন্দরী মেয়েদের শহর। হ্যাঁ সে সব সুন্দরী যারা অংকে কাঁচা এবং যাদের আইকিউ সীমিত। এত বড় বড় সোজা রাস্তায় গরম এক গ্লাস কফি নিয়ে উঠলে মাইল খানেকের মধ্যেই তা গ্লাসের গায়ে জ্বর থাকতে থাকতেই সাবাড় করে দেয়া যায়। স্টিয়ারিং আর ব্রেকের তেমন কাজ নেই তো তাই কফিটা গোগ্রাসে গেলা যায়।"

ওদের বাসাটা ছিল স্কুলের খুব কাছে। স্কুল পাড়া বলে অন্য বাংগালী ছাত্ররাও আশেপাশেই থাকতো। অধিকাংশরাই ওর বাবার চেয়ে বেশ জুনিয়র। কমবয়সী আন্টিরা এসে ওর মার সাথে আড্ডা দিত আর মাঝে মাঝে রান্না শিখতো। অবিবাহিত বাংগালী ছাত্ররা ওর মা-র হাতের রান্না খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকতো। মা ওদের প্রায় সবাইকে এতই যত্ন করে খাওয়াতেন মনে হত সবার সাথে ওদের একটা আত্মীয়তা আছে। ওর বাবা লেখাপড়া আর রির্সাচ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। ছুটির দিন ছাড়া বাবাকে বেশী সময়ের জন্য কাছে পেত না সে। প্রতিদিন বাবার প্রিয় মুখটা একবার দেখার জন্য সে বিছানায় শুয়ে চোখ টেনে জেগে থাকতো। বাবা এসে বিছানা থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহের চিহ্নটা ওর গালে এঁকে দিয়ে বলতো, "হ্যাপি ড্রিম মামনি"। একদিন মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে বাবা বলেছিল, "আমার পড়ালেখা শেষ হলে, আমি হব তখন মামনি আর মামনি হবে তখন বাবা।" অর্থটা সে বোঝেনি এটা বুঝতে পেরে সহজ করে ওর বাবা বলেছিল, "অফিস থেকে ফিরে তোর খেলার সংগী হব আমি আর তোর মামনি তখন স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবে হোমওয়ার্ক করবে, বুঝলি।"

ওর বাবা বিদেশে পড়ালেখা শেষ করার আগেই জীবন নাটক সাংগ করলো। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে যাওয়ার পথে গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট হল ওদের। কান্তা, ওর মা বাবা তিনজনই আহত হল। ওর বাবার মাথার আঘাতটা ছিল মারাত্মক। কান্তা আর ওর মা ক্রমানুয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেও ওর বাবা মাস দুয়েক কমায় থেকে আর চোখ খুলে তাকালো না। মা-র আর স্কুলে ভর্তি হওয়া হল না। ভাগ্যের লাটাই যার হাতে সেই সৃষ্টিকর্তার উপর সে সময় দারুন অভিমান হয়েছিল ওর। বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করার জন্য উনি কেন ওকে বেছে নিলেন। কান্তা আর ওর মা দেশে ফিরে আসে। ওর মা-র ঢাকার একটা কলেজে চাকরী হয়ে গেল। মা-র মুরুব্বী, শুভাকাংখী আর বান্ধবীরা অন্ততঃ ডজন খানেক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলেন। ওর মা সবাইকে নিরাশ করলো। কেউ কোন নতুন প্রস্তাব আনলেই সে দেখতো মা দেয়ালে টাংগানো ওর বাবার ছবিগুলো বারবার ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতো। ওকে সংগে নিয়ে পুরনোদিনের এ্যালবাম দেখাতো। কান্তাদের শুভাকাংখীরা ওর মা-র সিদ্ধান্তের ভীতটা যে কত মজবুত তা বুঝতে পেরে সবাই এক সময় চুপ করে গেল।

ওর বাবা বলেছিল পড়ালেখা শেষ করলে মাকে পড়ালেখা করতে পাঠিয়ে সে ওর মায়ের ভূমিকায় নেমে পড়বে, এই উলোট পালোটটা হুবহু হল না বটে তবে পরিবর্তন একটা ঠিকই আসলো ওর জীবনে, ওর মা হয়ে গেল একইসাথে ওর মা বাবা দুটোই।

কান্তা ভাবে, এরকম একটা মাকে শেষ বয়সে দেশে একা ফেলে স্বামীর সাথে চলে যেয়ে বিদেশে থাকাটা শুধু অন্যায়ই নয় মনে হয় মস্তবড় পাপ। শরীরটা হালকা হয়ে আসে কান্তার। মনের গুমোট ভাবটা আগের মত আর অসহনীয় মনে হচ্ছে না ওর এখন। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ধীর পায়ে আবার জানালার পর্দায় চোখ রাখে। আকাশে মেঘ করেছে, সকালের রোদের প্রখর চেহারাটা নেতিয়ে এসেছে। বাসার সীমানা ঘেষে বেড়ে ওঠা পেয়ারা গাছটার পাতাগুলোয় বাতাস এসে ছোট ছোট ঢেউ তুলছে। এক পলকা বর্ণহীন বাতাস কান্তার মুখে এসে আছাড় খায়। বাতাসের ঝাপটায় চোখ বন্ধ হয়ে এলেও প্রকৃতিটাকে এখন ওর সকালের চেয়ে বন্ধুসুলভ মনে হয়, যে বন্ধুকে স্মৃতি থেকে টেনে তুলে পুরনো দিনের প্রিয় একটা গল্প বলা যায়। কান্তারও এ মুহূর্তে নিজেকে বলার মত প্রিয় একটা গল্প মনে পড়ে। সাগরের সাথে পরিচয় ওর দু বছর আগে একুশে ফেব্রুয়ারীতে, জাতীয় শহীদ মিনারে, শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের সময়। কান্তা বাসায় থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করে। বান্ধবীরা ওকে সেদিন বিশে ফেব্রুয়ারির রাতটা হোষ্টেলে থেকে যেতে বলে। মেডিকেলের মেয়েদের হোষ্টেল আর শহীদ মিনার খুবই কাছাকাছি। বান্ধবীরা বললো সে রাতে ঘটা করে দল বেঁধে হল থেকে সব মেয়ে শহীদ মিনারে যেয়ে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবে। ঘরের বাইরে ওর কখনও রাত কাটানো হয়নি। বান্ধবীদের প্রস্তাবে সুযোগ এসেছে তবে মা ঘরে একা থাকবে বলে সে সবসময় লোভ সম্বরণ করেছে। তবে এবার রাজী হয়ে গেল, সন্ধ্যায় ও মাকে ফোন করে দিল চিন্তা না করার জন্য।

ঘড়ির কাটার সাথে কদম মিলিয়ে ঠিক রাত বারটা এক মিনিটে ওরা একদল মেয়ে প্রশস্ত সিড়ি ভেংগে শহীদ মিনারের খুব কাছাকাছি চলে গেল। প্রচন্ড ভীড় তবে কারও মধ্যে উশৃংখলতা নেই। কান্তা আশেপাশে চেয়ে দেখে, ঢাকা ভার্সিটির ব্যানারের সংখ্যাই বেশী মনে হয়। উঠতি বয়সী সদ্য ভার্সিটিতে আসা যুবক যারা বাংলা একাডেমীর বই মেলায় ওদের মত মেয়েদের দেখলে লুকিয়ে শীষ দেয় ওদের মুখেও একটি শিক্ষক সুলভ পবিত্র গাম্ভীর্য। ভীড়ের মধ্যেই কান্তা একসময় নিজের হাতে চোখ পড়তেই বিষম কাটে, আরে ফুলের তোড়াতো আনতে ভুলে গ্যাছে সে। ইচ্ছে করে নিজের ভুলের শাস্তি হিসেবে একবার কান ধরে উঠ বস করতে।

নিজের অজান্তেই বেশ কিছু সময় একখানে দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ পাশ থেকে আমেরিকান ছবি ফিলাডেলফিয়ার নায়ক টম হ্যাংকসের মত হ্যাংলা পাতলা এক যুবক ওকে বলে, "কী আপা, এগোচ্ছেন না কেন ? হাতে ফুল নেই বলে সামনে যাচ্ছেন না ? তা নিজের কাছে ফুলের চেয়ে সুন্দর যে জিনিসটি আছে, মানে আপনার মন, সেটাই না হয় শহীদ মিনারে দিয়ে আসুন।"

কান্তা বুঝতে না পেরে বলে, "জ্বী আমাকে কিছু বললেন?"

"নিন আমার কাছে একটা বাড়তি তোড়া আছে। এটা নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসুন।"

ছেলেটা আর ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। কান্তা জোড়ে হেটে বান্ধবীদের খুঁজে বের করে। শহীদ মিনারের বেদীতে ফুলের তোড়াটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সেই ছেলেটা আবার সামনে এসে দাড়ায়। সহজভাবে বলে, "তোড়া দেয়া হল, শান্তি লাগছে খুব তাইনা।"

"জ্বী আপনারও লাগছে নিশ্চয়ই।"

"আমিতো তোড়াই দেই নি।"

"মানে ? আপনি না বললেন আপনার বাড়তিটা আমাকে দিয়েছেন।" কান্তা রেগে যায়।

"রেগে যাচ্ছেন কেন ? আপনি দিয়েছেনতো, আমারও দেয়া হয়ে গেছে। আপনি দিয়েছেন একবার আর আমার দেয়া হয়েছে দুবার, দানের সহজ ফর্মুলা।"

কান্তার হঠাৎ মনে হল অপরিচিত একটা ছেলের সাথে বেশী কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, একটু বিরক্ত হয়ে বলে, "আপনি কি আমার পিছে লেগেছেন ?"

"পিছনে লাগবো কেন, দু দুবারই তো সামনে এসে সামনা সামনি কথা বললাম।"

"পথ ছাড়ুন, আমি যাব।"

"আপনার পথ কখনও আগলেই ধরিনি, ছেড়ে দেব কেমন করে।"

কান্তা নিজের ভুল বুঝতে পেরে "ও সরি" বলে সামনে এগিয়ে যায়। পিছন থেকে ডাক আসে, "হ্যালো, এই যে শুনছেন, মনে রাখার মত একটা ঘটনা করতে পারলাম তো ?"

কান্তা হোঁচট খায়, পিছনে ফিরে ওর ম্যাচুরিটির উপর ভরসা করে বলে, "হ্যা পারলেন। এবার কিন্তু আপনি পিছন থেকে ডাকলেন তাহলে কি বুঝতে হবে সত্যি সত্যি আপনি আমার পিছনে লেগেছেন ?"

সাগর কাছে এসে চোখে চোখ রেখে কান্তার চাহনীটা এক মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করার পর হন হন করে জন সমুদ্রে গা ঢাকা দেয়।

এ ঘটনাটা পরে অন্তত একমাসের মধ্যে চার জন বান্ধবীকে সে একাধিক বার বলেছে। মনে রাখার মত যে ঘটনা একটা সে রাতে ঘটেছিল সেটা মেনে নেয় সে। অনেকদিন পর বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে হাসপাতালের ক্যান্টিনে যখন সবাই আড্ডা দিচ্ছিলো এমন সময় ওর এক বান্ধবীর সাথে একজন অপরিচিত ছেলে ঢোকে। ওর বান্ধবী রিক্তা একেবারে ওদের টেবিলের কাছে ছেলেটাকে নিয়ে এসে কান্তাকে বলে, "কান্তা উনি তোর খোঁজ করছিলেন।" সাগরকে দেখে কান্তার মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়ে। ও বুঝে ওঠে না কেমন করে ছেলেটা ওকে খুঁজে বের করলো। সাগর ওর বিস্ময়কে আঁচ করতে পেরে বলে, "মেডিকেলের ছেলেমেয়েদের পরিচয় পত্র লাগেনা। ওটাতো সব সময় আপনাদের

গায়ে পড়া থাকে।”
একুশের রাতে কান্তার গায়ে এ্যাপ্রোন পড়া ছিল, শহীদ মিনারে যাওয়ার সময় খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল এটা ও ঠিক মনে করতে পারে। ক্যান্টিনে বসে সবার সামনে সাগরের সাথে ভদ্রতা করে ক্যাজুয়াল কয়েকটা কথা বলে সেদিন। সাগরের পরিচয়টা জানার চেষ্টা করে কান্তা।
তারপর, ঢাকা ভার্সিটির কার্জন হল আর ঢাকা মেডিকেল কলেজতো আর ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে নয়। কথা বলতে বলতে, মেলামেশা করতে করতে এক সময় প্রেমের একমাত্র শর্তটা উপস্থাপন করে কান্তা, সাগর ওর শর্তটা মেনে নিলে তারপর মন ভরে ভালবাসতে শুরু করে। কান্তা আগাগোড়া সাগরকে বলেছে ও মা কে ছেড়ে বিদেশে যেয়ে সেটেল হবে না কখনও। সাগর এ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে পড়ে, লেখাপড়ায় ধার আছে, ওর মত ছেলেদের গতানুগতিক পরিণতি উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা।
কান্তার খুব অভিমান তাই, কেন সাগর ভাবছে ও আজ প্রেমের নেশায় প্রেমের শর্তটাকে হালকা ভাবে নেবে। স্বামীর লেজ ধরে বিদেশে পাড়ি দিয়ে মায়ের বুকে একটা হিরোশিমা নামিয়ে দেবে। জানালার ধারে দাড়িয়ে ছিল ও। অভিমানে আরও আড়ষ্ট হয়ে যায়, হাত দিয়ে জানলার শিক শক্ত করে ধরে। গোলাপী কখন পিছনে এসে দাড়ায় কান্তা টের পায় না।
“ আপা, রিক্তা আপা আইছে। আপনারে ডাকে।”
রিক্তা ওর মেডিকেলের সহপাঠী। ও সব সময় বাসায় এসে ভনিতা না করে সরাসরি কান্তার ঘরে চলে আসে। আজ আসলো না কেন ? এটা ভাবতে ভাবতে বসার ঘরে এসে দেখে রিক্তা ওর মার সাথে কথা বলছে। কান্তাকে ঢুকতে দেখে ওর মা উঠে বলে, “ওকে একটু বোঝাও তো মা। বোঝাওতো যে এ মুহূর্তে আমার জন্য ও ভাববে না আমি ওর জন্য ভাববো, কোনটা বেশী জরুরী।”
“ খালাম্মা আপনি অস্থির হবেন না। আমরাতো আছি।”
“ সে ভরসাতো সবসময়ই ছিল তবে এখন কারও উপড়ই যেন আস্থা রাখতে পারছি না। তোমরা গল্প কর মা, আমি একটু কলেজ হয়ে আসি।”
কান্তার মা বেরিয়ে গেলে রিক্তা দাড়িয়ে টিপ্পনী কাটে, “ তিন বছর চুটিয়ে প্রেম করলি, প্রেমিক আজ শখ করে বলছে বর সাজবে আর তুই বলছিস তোর ফুলশয্যা ভাল লাগে না!” কান্তা কষ্টের হাসি দিয়ে বলে, “ আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস ?”
“ তোকে জ্ঞান দিতাম যদি নিজেকে জ্ঞানী জৈলসিং ভাবতাম।”
“ঠাট্টা করিস না।”
“ঠাট্টা আমি করছি, নাকি সাগর আর তোর ব্যাপারটা নিয়ে তুইই ছেলে মানুষী করছিস।”
“ তোরাতো জানিস রিক্তা আমি ওকে কতবার সাবধান করেছি বলেছি, যে মা আমার জন্য নিজের জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে তাকে একাকিত্বে ভাসিয়ে দিয়ে আমি কোথাও যেয়ে স্বস্তি পাব না।”
“ আহা আমেরিকায় পড়ার এত বড় একটা সুযোগ এসেছে। ওর ডিগ্রীটা শেষ হলে না হয় চলে আসিস।”
“ ডিগ্রী শেষ হলে চলে আসিস, বললেই হল, ঐ দেশ থেকে ডিগ্রী শেষ করে কজনে ফিরে এসেছে বল ? গেলে কি হবে জানিস, ও পড়ালেখা শেষ করবে আর আমি তিন পার্ট ইউ এস এম এল ই পরীক্ষা দিয়ে একটাও ইন্টারভু না পেয়ে বাসায় বসে ছেলেমেয়ের সর্দি কাশী হলে প্রেসক্রিপশন লিখবো আর ওভার দা কাউন্টার থেকে সস্তা ঔষুধ কিনে আনবো।” কান্তা উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না।
রিক্তা ওকে শান্ত করে বলে, “ খালাম্মাকে না হয় ক বছর পর নিয়ে যাস।”
“ নিয়ে যেয়ে কি পেটচুক্তিতে নিজের বাচ্চার বেবীসীটার বানাব মাকে। আহা আমাদের মায়েদের কি কপাল, আমাদেরকে বাথরুম করালো, আমাদের ছেলেমেয়েদেরও বাথরুম করাবে।”
“ সাগরের কথা অন্ততঃ ভেবে দেখ।”
“ আগে অনেক ভাবতাম, এখন আর ভাবি না, আগে ও আমার কথা ভাবুক তখন আবার ভাবতে শুরু করবো।”
“ আমার মনে হয় কান্তা তুই সাংঘতিক একটা ভুল করছিস। প্রেমিক প্রেমিকার মেলামেশাটা এ বি সি চ্যানেলের সারভাইবার সিরিজের নায়ক নায়িকাদের মত হলে চলে যে একাই এগিয়ে যেয়ে মিলিয়ন ডলার জিতে নিবি ?”
কান্তা প্রসংগ বদলানোর চেষ্টা করে বলে, “রিক্তা চা খাবি ? চা খেয়ে আজ চলে যা। রাতে তেমন ঘুম হয়নি ভাবছি গোসল করে অবেলা হলেও একটু ঘুমুতে চেষ্টা করবো।”
রিক্তা চা না খেয়েই চলে যায়। কান্তা গোলাপীকে এক ডেকচি গরম পানি করে দিতে বলে। তারপর গোসল সেরে সত্যি সত্যি বিছানায় যায়। বিচিত্রাটা খুলেই ভাবে দেখবে লেখা আছে, “ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সম্পাদক শাহাদত হোসেন।” কিন্তু এ কি ? বিস্মিত হয় কান্তা, লেখা আছে শেখ রেহানা, মনে মনে বলে, “ এ মেয়েটা সাহিত্যিক বা কলামিষ্ট না হয়ে রাতারাতি সম্পাদক হল কেমন করে।” ভাবে লন্ডনে একটা ফোন করে গাফফার চৌধুরীকে বলবে, “ গাফফার ভাই শেখ রেহানার কোন লেখা পড়েছেন কখনও ?”
দরজা খোলার আওয়াজ হয়, কান্তা বুঝতে পারে বোধহয় ওর মা ঘরে ঢুকলো। চোখের উপর ফর্সা আলো এসে পড়ে, ওর মা সুইচটা টিপে আলো জ্বালিয়ে বলে, “ এই অবেলায় অন্ধকারে শুয়ে আছিস কেন ?”
কান্তা উঠে পড়ে। মায়ের কাছে যেয়ে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই মা চলে যায়। মনটা আরও উদাস হয়ে যায়। পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে নার্ভাস টাইপের ছাত্রছাত্রীরা যেমন বারান্দায় অর্থহীন পায়চারি করে কান্তাও জীবন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে ঘরের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম করে। গোলাপী ঘরে ঢুকে গলায় হৃদয় মিশিয়ে ডাকে, “ আপা আপনারে চা দিমু ?”
“ এই গোলাপী, তুই এত আদর করে ডাকিস কেমন করে রে ? তুই আদর শিখলি কোথায় ? বাড়ীতেতো শুনেছি সৎমা সারাক্ষণ কষ্ট দিত।”
“ ওটা শিখেছি আপনাগো বাড়ীতে আইসা। তয় দুই দিন ধইরা যেমন গাল ফুলাইয়া রাখছেন, দেখবেন পরশুদিন থাইকা আমি গাল ফুলাইয়া চা দিমু। ভাল লাগবো তখন আপনার ?”
“ একদম না।”
“ তাইলে এখন একটু হাসেন তো।”
কান্তা না হেসে পারে না। গোলাপীকে বলে, “ এই গোলাপী চা খাবি, তোকে চা করে দি ?”
“ ঐটা উল্টা নিয়ম আপা, বাজানে আপনাগো বাড়ীতে রাইখা যাওনের সময় সাবধান কইরা গ্যাছে, বলছে, “ কখনও উল্টা নিয়মে চলবি না।”
আচ্ছা ঠিক আছে তোর চা খেতে হবে না চল ছাদে যাই। গোলাপী হেসে বলে, “ ও আল্লা আমার কি চাঁদ দেখনের বয়স হইছে আপা ?”
“ বয়স হলে যাবি ?”
“ বুড়ী হইয়া গ্যালেও আমার চাঁদ দেখনের বয়স হইবো না। টিভিতে কাজের মাইয়াগো কখনও ছাদে উইঠা গান গাইতে, চাঁদ দেখতে বা তারা গুনতে দেখছেন ?”
সত্যিতো, কান্তা কখনও এরকম দৃশ্য দেখেছে বলেতো ওর মনে পড়ে না। তবু গোলাপীকে জোড় করে,
“ চল চল, গ্যালে কিছু হবে না।”
“ জ্বী না, হাজার বললেও না কারণ এইটাও উল্টা নিয়ম। বরং আপনি যান আমি চা কইরা দিয়া আইতাছি।”
গোলাপী চলে যায়। কান্তা ড্রইংরুমে উঁকি দেয়, দেখে মা ইটিভির খবর দেখছে। তারপর ও পায়ে পায়ে ছাদে উঠে যায়। আকাশটা চাঁদনী মাখা। ওর মনে হয় আজ অমবস্যা হলে ভাল হত, প্রকৃতিটাকে মনের অবস্থার অনুকূলে পেত। তবু বিধাতার প্লানেটোরিয়ামের দিকে তাকিয়ে পরিচিত নক্ষত্রদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। ওর মনে পড়ে, ওরা যখন পার্বতীপুরে রেলের বাংলোতে থাকতো বাবা ওকে একসাথে নিয়ে গোটা আকাশটা হেঁটে বেড়াতো। কত কি শেখাতেন উনি। বাবার স্মৃতি মনে হলেই ওর চোখ দুটো জলে ভোরে ওঠে। ভাবে ওর বাবা বেঁচে থাকলে সাগর যেটা আজ চাচ্ছে তার চেয়ে ঢেড় বেশী ছাড় দিত ও।
পায়ের আওয়াজ পেয়ে পিছনে না ফিরে বলে, “ কিরে গোলাপি চা এনেছিস ?”
হালকা পায়ে সাগর কান্তার কাছে যেয়ে বলে, “ তোমাদের কাজের মেয়ে গোলাপী না, তোমার কাজের ছেলে এসেছে।”
কান্তা সাগরকে দেখে অবাক হয় না। এ বাড়ীতে ও বলেও আসে না বলেও আসে, এমনটাতেই সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নির্জীব ভাবে বলে, “ তুমি আমার কাজের ছেলে ?”
“ দেশে থাকলে হতাম না। বিদেশে যারা প্রবাসী হয়ে থাকে শুনেছি ওখানে এ নিয়মটাই চালু আছে। বউরা হয় বাসার বুয়া আর স্বামীরা হয় পারমানেন্ট আব্দুল। ওখানে তো আর এখানকার মত গোলাপীদের পাবে না।”
কান্তা সাগরকে ভাল করে চেনে। বোঝে সাগর ওকে সহজ করার চেষ্টা করছে। মেজাজের পরিবর্তন না এনেই বলে, “ শুক্রবার তোমার ফ্লাইট ? আমাকে কি এয়ারপোর্টে সি অফ করতে যেতে হবে ?”
“ সি অফ টি অফ গুলি মার, আগে বল তোমার পাগলামী ছেড়েছোতো ? কাল কিন্তু বাবা মা আসবেন আংটি নিয়ে। বড় ফুপি যেয়ে প্রো এ্যাকটিভ ভাবছি একটা মৌলভী না সাথে নিয়ে চলে আসে।”
“ একটা মেয়েও সাথে করে আনতে বল ওনাকে।”
“ এখনও আকাশটা মেঘ করে আছে দেখছি।”
“ আমার মতামতটা তো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি। রিক্তার সাথে তোমার নিশ্চয়ই কথা হয়েছে আজ। ও নিশ্চয়ই বলেনি যে আমি মা-র সাথে লাল চেলী কিনতে গাউসিয়া গেছি।”
“ এতদিন ধরে আমরা মেলামেশা করছি কান্তা, আঁকাশে চাদনীর আলো তবুও মনে হচ্ছে তোমাকে চিনতে পারছি না।”

(৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

BANGLADESH MARKET

6069 Cahalan Ave., San Jose, CA 95123

(408) 225-8887

নতুন বাংলা নাটকের জন্য যোগাযোগ করুন
৪০৮-৩৬২-৯৭৩৭

যাবতীয় বাংলাদেশী গ্রোসারী সামগ্রী এবং বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয় সহ সব ধরনের অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের এখানে সবধরনের হালাল মাংস, বাংলাদেশী মাছ
পাওয়া যায়

ইকবাল হাসানের একগুচ্ছ কবিতা

হে সুন্দর

১.
তোমাকে ছেড়ে আর কোনদিন
যাবোনা কখনো দূরে
তুমি ছেড়ে গেলে তবে -
ছায়ার মতোন থেকে যাবো আমি
তোমার-ই অন্ত:পুরে।

২.
অবগুণ্ঠন খুলে দাও আজ
আকাশ নামুক হেসে
এক মুহূর্তের জন্যে হলেও -
বৃষ্টি ধারায় ক্ষত মুছে দাও
সবকিছু যাক ভেসে।

৩.
তোমাকে লাগছে পাথর প্রতিমা
হালকা নীলাভ সাজে
কিছুটা রক্তিম হ'লেও আকাশ -
চারদিকে নীল-ধূসর-হলুদ
আঁচলের ভাজে ভাজে।

৪.
যে দ্যায় উড়াল পাখির মতোন
বুকের ভেতর থেকে
আমি তাকে নাম দিয়েছি পরী -
অপ্সরী সে হ'লেও হ'তে পারে
বুকের ভেতর রেখেও যদি তাকে
একটি বারও স্পর্শ না করি!

পরকীয়া

১.
কে যে আমার বুকের ভেতর
তপ্ত আগুন ছাইয়ের বোঝা
অস্থি মজ্জা হাড়ের ভেতর
রক্ত কণায় তাকেই খোঁজা

২.
খুঁজতে খুঁজতে মাস চলে যায়
বছর ঘুরে আসে
আমার মনের আকাঙ্ক্ষারা
স্বপ্নালোকে ভাসে

৩.
ভাসার কথা উঠলো যখোন
আসল কথাই বলি :
মধ্যরাতে ঘুম ছুটে যায়
আকাশ দেখতে চলি

৪.
আকাশ জুড়ে দেখতে পেলাম
এক পলকের উঁকি
মন বলেছে এই শ্রাবনে
তোমার দিকেই ঝুঁকি!

জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য

মৃত্যু ছাড়া কবিতা হয়না।
উষ্ণতা কারো কারো কাম্য হতে পারে। স্বাভাবিক।
আশ্চর্য শীতল বলে কেউ কেউ এড়িয়ে যায় মৃত্যু দৃশ্যগুলো।
যদিও এ প্রবণতা গদ্যে যতটা সচল, কবিতায় নয়।
কবিমাত্র মৃত্যুকামুক।
তার কামভাব মূলত: মৃত্যুতাড়িত।
অতএব মৃত্যুর ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হয় অন্ধকার গুহার ভিতরে।
লাইন ও হাফটোনে আসলে সে যা লেখে
মৃত্যু তার নাম।

তার রেখা চিত্র থেকে রাতভর জলরঙে মৃত্যু ঝরে পড়ে।

দাদুর চিঠি

মীজান রহমান

তোমার কার্ড পেলাম দাদু। হালকা হলুদ রংয়ের চকখড়ি দিয়ে কি লিখেছ ঠিক পড়তে পারছি না, তবু তোমার নিজের হাতের আঁকা দাগগুলো, উলোটাপাল্টা অক্ষরগুলো খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছে তোমার দাদী। কেন রেখেছে জানিনা। দুদিন পরেই তো সে ভুলে যাবে কোথায় রেখেছে। তোমার মা আর তুমি দুজনে মিলে চক্রান্ত করে ভ্যালেন্টাইন কার্ড পাঠিয়েছ আমাদের। সেই কার্ডের ওপরে আছে দুটি গোলাপের ছবি। ভেতরে একটা লতার ওপর দুটি পাখি বসে আছে। হয়ত ভেবেছ তোমার এই বুড়ো দাদু আর দাদীও বুঝি আজকের দিনে মোমের বাতি জ্বালিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। হাসি পাচ্ছে তোমার? হাসো। খুব করে হেসে নাও। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও হাসি পায় দৃশ্যটা কল্পনা করে। দুজনে যে কতকাল আমরা মুখোমুখি হইনি তার হিসেব নেই। মুখোমুখি হবার সঙ্গত কারণও সব হারিয়ে গেছে এখন। অন্যমনস্ক হয়ে যদিবা কখনও চেয়ে থাকি তার মুখের দিকে সে খ্যাঁচ করে ওঠে : কি, অমন করে হাবার মত চেয়ে আছ কেন? জীবনে দেখনি আমাকে? তখন কি মোমের বাতির কথা ভাবা যায় বল। সুতরাং হেসে নাও যত পার। এই তো হাসবার বয়স। তোমার বয়সে আমিও হাসতাম। কারণে অকারণে হাসতাম, বোকার মত হাসতাম। তারপর বড় হয়ে কখন যে হাসিটা ভুলে গেলাম মনে নেই। বড় হলে মানুষের হাসবার সময় থাকে না। তখন শুধু ছোটার সময়। শ্বাপদতাড়িত ভীত হরিণের মত। কিসের পেছনে ছুটছি সেটা ভালো করে না জেনেই আমরা ছুটছি। দৌঁড়েছি, কেবল দৌঁড়েছি। তখন আমাদের বড় বাড়ি, দামী আসবাব আর জড়োয়া গয়না ছিল না রাশি রাশি কিন্তু বাগানে প্রচুর ফুল ছিল, গাছের শাখাতে পাখিরা বসে কিচিরমিচির করত। কিন্তু সেই ফুল কুড়িয়ে তোমার দাদীর খোঁপাতে গুজবার সময় হয়নি আমার। গাছের ছায়ায় বসে পাখিদের গান শোনারও সময় হয়নি। এখন আমাদের সময়ের অভাব নেই। কিন্তু এখন আর বাগান নেই, পাখিরাও চলে গেছে। এখন তুমি ফুল পাঠালেও কোথাও গোঁজার জায়গা নেই। তোমার দাদীর চুল পড়ে গেছে সব। এখন আমরা হাসতে চাইলেও হাসতে পারি না। লোকের সামনে হাসতে লজ্জা করে, নকল দুপাটি দাঁত কখন না ফস করে খুলে যায়। তাই বলি দাদু, হেসে নাও। জীবনের শেষে এই হাসিগুলোর কথা ভেবেই তোমার কান্না পাবে একদিন।

আগামী বছর এমনি আর ভ্যালেন্টাইন কার্ড পাঠাবে কিনা জানিনা। পাঠালেও হয়দ হলুদ চকখড়ি দিয়ে লিখবে না কিছু। হয়ত বদলে ইমেইল পাঠাবে। আজকাল তো লোকে চিঠি লেখে না, ইমেইল পাঠায়। চিঠিটা বড় সেকেলে জিনিষ। তোমার জন্য হয়ত আরেকটা হাসির জিনিষ। অবাক হয়ে ভাবছ নিশ্চয়ই, কম্পুটার থাকতে লোকে আবার চিঠি লেখে কোন আক্কেলে। কিন্তু আমি বড় সেকেল মানুষ দাদু। সেটা তুমি টের পেয়ে গেছ নিশ্চয়ই। যে লোক এখনও কম্পুটারের চাবি টিপতে ভয় পায় সে লোক তো যাদুঘরের কৌতুহল ছাড়া কিছু নয়। যে লোক সেলফোন হাতে না নিয়েই গাড়ি চালায় সে তো আশ্রমে থাকার যোগ্য, তাইনা দাদু? যে লোকের বাড়িতে সিডি বাজাবার সরঞ্জাম নেই, মান্ধাতার আমলের স্টেরিওতে যে এখনও পঙ্কজ মল্লিক আর হেমন্তকুমারের নাকি কান্না শোনে সে লোক তো জন্ম থেকেই বৃদ্ধ। আমি হলাম তোমার সেইরকম বৃদ্ধ দাদু। জন্মদাদু। তোমার দাদী তো আমার চেয়েও এককাঠি বাড়া। আর সার্টিফিকেটে লেখা উচিত ছিল : জন্মকাল অষ্টম শতাব্দী, প্রসুতিকাল বিংশ শতাব্দী। সুতরাং আমাদের দ্বারা ইমেইল পাঠানো হবে না কোনদিন। তুমি পাঠাতে চাও পাঠিও। আমরা বরাবর চিঠিই লিখে যাব। তুমি হাসবে তো? হাসো। তোমাকে হাসাতে পারলে তো আমাদের ভালো লাগবে।

ইচ্ছে ছিল তোমাকেও একটা কার্ড পাঠাই আমি। কিন্তু যে-কার্ড পাঠাতে চাই তোমাকে সে-কার্ড তো এদেশের বাজারে বিক্রী হয়না। এদেশে এখন ইষ্টারের হুযুগ। বাজার ছেয়ে গেছে ইষ্টারের কার্ডে। তোমার স্কুলের টিচার নিশ্চয়ই ইষ্টারের অনেক গল্প বলেছেন তোমাকে। ইষ্টার বানি আর ইষ্টার এগের কথা তুমি হয়ত আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝ। কিন্তু আমি ইষ্টার বুঝি না দাদু। আমার জন্যে এটা ইষ্টারের ঋতু নয়, নববর্ষের ঋতু। তুমি হয়ত চোখ বড় বড় করে বলবে সে আবার কেমন কথা। নববর্ষ তো মাত্র সেদিন হয়ে গেল। দুমাসও পার হয়নি। আমি সেই নববর্ষের কথা বলছি না দাদু। আমার নববর্ষ এদেশে হয়না, আমার নববর্ষ শুধু একটা দেশেই হয়। ঐ দেশেতেই আমার জন্ম। তোমার দাদীর জন্ম। আজ থেকে বহু হাজার বছর আগে যখন আমেরিকার জন্ম হয়নি, ক্যানাডার জন্ম হয়নি, তখনও ছিল আমার দেশ। সেই দেশেরই অধিবাসী ছিলেন তোমার-আমার পূর্বপুরুষ। ক্যানাডা-আমেরিকার চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধি ছিল সেদেশে, ছিল অনেক সুখশান্তি। চোদ্দশ বছর আগে ঐ দেশেরই এক রাজা প্রবর্তন করলেন নতুন সাল যাকে বলা হয় বঙ্গাব্দ। এদেশে তোমরা পালন কর খৃষ্টাব্দ, ওদেশে আমরা পালন করি বঙ্গাব্দ। আমাদের বঙ্গাব্দেরও বারো মাস, তোমাদের মত। আমাদের মাসগুলোও ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে, এদেশের মত। তফাত এই যে আমাদের দেশে ঋতুর সংখ্যা ছ'টা - গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এদেশে চারটা - শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত। যদিও আমার বুড়ো শরীরে মাঝে মাঝে মনে হয় ক্যানাডার এই অঞ্চলটাতে আসলে দুটোই ঋতু - শীত আর প্রচন্ড শীত।বঙ্গাব্দের প্রথম মাসটির নাম বৈশাখ। আমাদের বৈশাখ তোমাদের জানুয়ারীর মত নিস্তেজ আর নির্জীব নয়। আমাদের বৈশাখ কখনো রুদ্র কখনো শান্ত কখনো অশান্ত উশৃংখল। আমাদের বৈশাখ শুধু মানুষের উৎসব নয়, প্রকৃতিরও উৎসব। বৈশাখ এলে গাছপালা পশুপখী পোকামাকড় সবাই যেন হাঁটের মেলাতে বসে যায়। জেগে উঠে সব বনবাদাড়, খালবিল, জলাজঙ্গল। বৈশাখের সেই মাতোয়ারা রূপ চিঠিতে বোঝানো সম্ভব নয় দাদু। আমাদের বৈশাখ এমনই এক জীবন্ত জিনিষ যে তাকে কোন রঙীন কার্ডের খামে ঢোকানো যায় না।

আমাদের দেশের বৈশাখ যেমন করে নতুন জীবনের বার্তা বয়ে আনে, যেমন করে বাজায় নতুন বছরের আগমনধ্বনী তেমন করে কি বাজায় তোমাদের জানুয়ারী? কই, আমি তো আজো বুঝলাম না ডিসেম্বর আর জানুয়ারীর তারতম্য।চল্লিশ বছর ধরে আমি

বিদেশে থাকলাম, তবু তো এখনো আমি ডিসেম্বরের ঠান্ডায় যেমন ঠকঠক করে কাঁপি জানুয়ারীতেও ঠিক একইভাবে কাঁপি। শুধু নববর্ষের কার্ড ছাপিয়ে আর মদের বোতল ভেঙে যদি নতুন কিছু আনা যেত সংসারে তাহলে কি সুখের অন্ত থাকত কারো। তুমি কোনদিন বুঝবার সুযোগ পাবে না দাদু, কিন্তু আমাদের বৈশাখের একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। চৈত্রের থেকে যা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই বাঙালি জীবনে বৈশাখের চেতনা আসে অনেক অল্প বয়স থেকে।তোমার জন্ম যদি এদেশে না হয়ে ওদেশে হত তাহলে তোমার মধ্যেও হয়ত বৈশাখের অনুভূতি চোখ মেলতে শুরু করত এদ্দিনে।

কবেকার কথা মনে নেই। তখন আমার বয়স হয়ত তোমারই মত পাঁচ আর ছয়ের মাঝামাঝি ঝুলছে। বাবামা শহরে থাকতেন বলে আমিও শহরেই থাকতাম। ঋতুর ঘড়িটা তেমন বোঝা যেত না শহরের অলিগলিতে। তবে শীতটা আমার ভালো লাগত মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা ভাবটার জন্যে।আমাদের দেশের শীতটা এদেশের হেমন্তের মত খানিকটা। দিনের বেলা তাপমাত্রা পঁচাত্তর পর্যন্ত উঠে যায়, আবার গভীর রাতে নেমে আসে পঞ্চাশে। তখন ভাইবোনেরা সব লেপের ভেতরে ঢুকে মাথা গুজে ঘুমিয়ে থাকতাম আরাম করে।শীতকালে অবশ্য ঢাকাতে একটা জিনিষ দেখেছি যা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। ঘুড়ি। ঘুড়ি কাকে বলে জান দাদু? না জানারই কথা। আজকাল তো অনেক পুরনো জিনিষের মত ঘুড়িটাও অচল হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালে শীতকালের ঢাকাতে ঘুড়ি ছিল একটা বিরাট ব্যাপার। সারা শহর তখন মেতে উঠত ঘুড়ির উৎসবে। ছেলেবুড়ো সবাই। বিশেষ করে কুট্টিপাড়ায়। সে গল্প না হয় আরেকদিন বলব তোমাকে। ঘুড়ির উৎসব শেষ হত মাঘ মাসের শেষের দিকে।অর্থাৎ শীতের শেষ, বসন্তের শুরু। আস্তে আস্তে ফুল ফুটতে শুরু করত গাছে গাছে। মৌমাছিরা ভনভন করত চারদিকে। পাখিদের কিচিরমিচিরে স্বস্তি পাওয়া যেত না কোথাও। আমি হেঁটে হেঁটে রমনায় চলে যেতাম কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল দেখার জন্য।রমনার আকাশ যেন লাল হয়ে উঠত কৃষ্ণচূড়ার আভায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দাদু। একবার দেখার পর সারাজীবনের জন্যে ছাপ লেগে থাকে মনে সেকথা তুমি বুঝবে না। আমার দেশের লোকও বোঝে না এখন। গাছগুলোকে কেটে ওরা সব বড় বড় দালান বানিয়েছে। দালান দেখতে আমার ভালো লাগে না।

ছোটকালে বসন্তকালটাকে কেমন অদ্ভুত মনে হত আমার। তান্ডব নেই, মেঘ নেই, বর্ষা নেই। প্রকৃতি যেন ঝিমোয় কেবল। খালবিল যেন শুকনো কাঠ হয়ে যেত সব, নদীনালা সব স্তব্ধ নিথর, কৃষকের চাষের জমি সব ফেটে চৌচির। গ্রামে গেলে দেখতাম মাচায় ঘোমটা পরা গায়ের বধূর কাঁখের কলসী নিয়ে দূর দূর জায়গা থেকে পানি ভরে আনছে তৃষ্ণার্ত পরিবারের পানীয়ের জন্যে। দুপুরের ফাটা রোদ্দুর যেন বয়লারের তাতা আগুন। ফাল্গুনের শেষ থেকে চৈত্রের শেষ অবধি মনে হত যেন চিতায় জ্বলছি। ঢাকা শহরে দেখতাম রাস্তার পীচ গলে পড়ছে। সেই গলা পীচের ওপর গরিব ঠেলাগাড়িওয়ালারা ঠেলাগাড়ি টেনে যেত খালি পায়ে, সেটা দেখতাম। ফেরিওয়ালারা ফেরি করত, ভিখারীরা ভিক্ষা করত, দেখতাম। তোমাকে সেসব কিছুই দেখতে হবে না দাদু, সেটাই তোমার পরম সৌভাগ্য। কোনদিন তোমাকে খালিপায়ে হাটতে হবে না পীচঢালা রাস্তার ওপর, ক্ষিধে চাপবার জন্যে রাস্তার কল থেকে পানি খেতে হবে না বারবার, রাস্তার ধারে ছেড়া মাদুড়ের শয্যায় ইঁটের বালিশে মাথা রেখে ঘুমোতে হবে না কখনো। তুমি জাননা কত ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ তুমি।

অথচ তোমার দুর্ভাগ্যের কথাটাও মাঝে মাঝে ভাবনায় আসে আমার। তুমি এদেশে জন্মেও ঠিক এদেশের ছেলে নও। ওদিকে বাংলাদেশ তোমার পিতৃভূমি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে কত রূপের দেশ, কত বর্ণ শোভা আর ধনধান্যের দেশ সেটা তুমি কোনদিনই বুঝবার সুযোগ পাবে না। বইপুস্তকে হয়ত পড়বে যে বাংলাদেশ একটা জনবহুল গরিব দেশ যার অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত গ্রামীন কৃষক। কিন্তু এই গ্রামীন জীবনে কত মাধুর্য, কত মায়ামমতা, গভীর মানবতা, সেটা তো কোন বই পড়ে পাবে না তুমি। এই মানবতার পরিচয় আমি পাই ছোটকাল থেকেই। আমার বয়স যখন দশের কোঠাতে পৌঁছায় তখন বাবামার অনুমতি নিয়ে আমি গ্রামে যেতাম ঘনঘন। আমার কাকাকাকী মামামামীরা সবাই থাকত গ্রামে। বইপুস্তকের সেই অশিক্ষিত গরিব কৃষক। তাদের আদর আহ্লাদ, স্নেহভালোবাসা, আতিথেয়তা তাদের প্রাণের প্রাচুর্য, তাদের নিরলংকার জীবনের স্বচ্ছ সারল্য, চরম দু:খের মাঝেও তাদের প্রাণ খুলে হাসবার এবং অন্যকে হাসাবার ক্ষমতা - এগুলোই আমাকে বারবার টেনে নিত গ্রামের দিকে। ট্রেন থেকে নেমে আমি প্রায় এক দৌড়ে ছুটে যেতাম গ্রামের বাড়ি। উদগ্রীব হয়ে থাকতাম পাজামা খুলে লুঙ্গি পরার জন্য, শার্ট খুলে গামছা ঝুলানো কাঁধে, তারপর জুতো খুলে খালি পায়ে ছুটতাম খালের দিকে। খালের পানিতে নেমে চাচাতোভাই আর পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ঘাসফড়িং ধরতাম, কখনোবা পোনামাছ ধরতাম গামছার বেড়ি দিয়ে। কখনো শাপলার ফুল পেড়ে কাচা খেয়ে ফেলতাম। চৈত্রের খরাতে কাকারা দলেবলে মাছ মারতে যেতেন আশেপাশের খালবিলে। আমিও বায়না ধরতাম তাদের মঙ্গে যাওয়ার জন্যে। শহুরে ভায়ের ছেলে বলে আমার একটা আলাদা খাতির ছিল গ্রামে। আমার আব্দার আর দাবিদাওয়া তারা সহজেই মেনে নিতেন। ফলে গ্রামে যাওয়ার আরেকটা আকর্ষণ ছিল আমার - স্বাধীনতা। প্রশ্রয়। যেটা আমি শহরে পেতাম না। দুপুরবেলা ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম, দেখতাম দাদী আমার জন্যে ডিমের তরকারি রেধে রেখেছেন, কিম্বা কাঁঠালের বিচি দিয়ে ডাটার তরকারি যেটা আমার খুব প্রিয় খাবার ছিল এককালে।নিজেদের ক্ষেতের ডাটা, নিজেদের গাছের কাঁঠাল থেকে শুকনো বিচি, নিজেদের ঘরের মুরগীর পাড়া ডিম, এমনকি হলুদ মরিচ তেলরসুনও নিজেদেরই ক্ষেত থেকে তোলা। তার স্বাদই আলাদা। রবিশষ্যের মৌসুমে আমি মাঝে মাঝে ক্ষেতে গিয়ে মূলা কুড়িয়ে খেয়ে নিতাম, খেতাম কাচা ক্ষিরা আর মটরশুটি। আমার কাকাদের গোয়ালে দুটো গরু ছিল যার দুধ বিক্রী করার জন্যে তারা বাজারে নিয়ে যেতেন রোজ সকালে। আমি যখন বেড়াতে যেতাম দুই গ্লাশ দুধ আলাদা করে রাখা হত আমার জন্য। গরুর দুধ দিয়ে আমার ফুফুরা মাখন বানাতেন। সেই মাখন থেকে দাদী বানাতেন ঘি। আমি তাজ্জব হয়ে দেখতাম। সেসময় মনে হত মাখন আর ঘি বানানোর মত শক্ত জিনিষ বুঝি সংসারে আর একটি নেই। সেসব ভাবলে এখন হাসি পায়। মন চায় কেবল ওসব দিনে ফিরে যাবার জন্যে। সেটা আর সম্ভব নয়। সারল্য কখনো ফিরে আসো না জীবনে।

চৈত্রের গরমে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে। বিশেষ করে শহরের বদ্ধ আবহাওয়ায়। সেকারণেই আমি চৈত্রের ছুটিতে প্রায়ই গ্রামে চলে যেতাম। গ্রামের গাছগাছারি আর লতাপাতার ছায়াতে গরমের প্রকোপটা অত গায়ে লাগত না। মাঝে মাঝে লম্বা খরা হত দেশে। তখন গ্রামেও অসহ্য মনে হত জীবন। যেন গা পুড়ে যাবে। টিনের চালগুলো এমন গরম হয়ে উঠত যে

(৩১শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(২৫শ পৃষ্ঠার পর)

“ আমার ভাল লাগছে না সাগর তুমি এখন চলে যাও ।” গোলাপী দুকাপ চা নিয়ে ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায় । সাগর গরম চা টেনশনে বেশ তাড়াতাড়ি সাবাড় করে দেয় । চা শেষ করে বলে, “ তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না কান্তা তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছো ?”

“ একদম না ,” কান্তা জবাব দেয় ।

“ তোমাকে আমি একশোটা গল্পের বই এনে দিতে পারি যেগুলো পড়ে দেখবে এরকম সিচুয়েশনে মেয়েরা শুধু নিজের কথাই ভাবে না ।”

“ জীবন থেকে উপন্যাস আসে, উপন্যাস পরে কেউ জীবন গড়ে না সাগর । তুমি চলে যাও । আমি হুমায়ুন আহমেদ কে ফোন করে আমাদের গল্পটা বলে দেব, সামনের ঈদে বাংলাদেশের মানুষ টিভির পর্দায় তোমার আমার গল্পটা দেখতে পাবে। পত্রিকায় ঐ নাটকের সমালোচনা বের হলে একটা কপি তোমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব, দেখ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কার পক্ষে গেল, তোমার না আমার ।”

সাগর অধৈর্য্য হয়ে বলে, “ তোমার কি তাহলে এটাই শেষ কথা কান্তা ?”

কান্তা সাগরের মলিন মুখ দেখে ভাবে, ওকে সাহায্য করতে পারলে ভাল হত । সাহায্য করতে পারছে না বলে কেন জানি ওকে অপরাধীও লাগছে না নিজের কাছে । সাগরকে নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করে, “ তোমার বাবা মারা গেলে তোমার মাকে কে দেখবে সাগর ?”

“ কেন বড় আপা আছে না ?”

“ আর বড় আপারও যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায় ।”

“ ভাগ্যের লাটাইটা তো আমাদের হাতে নয় তাই সেরকম কিছু তো ঘটবে না এটা জোর দিয়ে বলি কেমন করে, তবে সেরকম কিছু ঘটলে বাবু আছে না ?” বাবু সাগরের ছোটভাই ।

কান্তা এবার ভারি গলায় বলে, “তোমার বাবাও আছে, তোমার মার বাবুও আছে একবার ভেবে দেখ আমি ছাড়া আমার মায়ের কে আছে ?”

এত বড় কঠিন প্রশ্নের উত্তর সাগরের জানা নেই । হেরে গেল এমন ভাব করে সাগর ওর হাতে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দেয় তারপর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায় । কান্তা জানে সাগরের এভাবে চলে যাওয়াটায় অভিমান মিশে আছে । ও নিজেও নীচে নেমে আসে, বারান্দায় টেবিলে কাপ দুটো রেখে দেয় । শুনতে পায় বসার ঘরে মা সাগরকে জিজ্ঞাসা করছে, “ পাগলীটার মাথা থেকে ভূত নামলো বাবা ?” কান্তা বুঝতে পারে সাগর কোন জবাব দেয় না । বাইরের দরজাটা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পায় সে । বোধহয় সাগর চলে গেলো।

কান্তার খুব ইচ্ছে হয় মাকে জিজ্ঞেস করে মায়ের অনুভূতিটা জানতে । জিজ্ঞেস করা হয় না তাই জানাও হয় না, ওতো অন্তর্যামী না ।

কান্তা নিজের ঘরে এসে জানালার পাশে দাঁড়ায় । বাইরে বাতাসটা বেড়েছে । কান্তা ভাবে বাসার আশেপাশে গাছপালা আরও ঘন ঘন হলে আর ওদের বাড়ীটা পাহাড়ের উপর হলে মনের মত দারুন একটা প্রকৃতি পাওয়া যেত । এমন প্রকৃতির মাঝে তাহলে হয়তো সে সহজেই ভাবতে পারতো সাগর একদিন সত্যি ফিরে আসবে, এসে বলবে, “ আমি বিদেশে থেকে যাইনি কান্তা, ফিরে এসেছি । তোমার এত খাঁটি ভালবাসা এতো সহজেই কি মিথ্যে হয়ে যাবে ?”

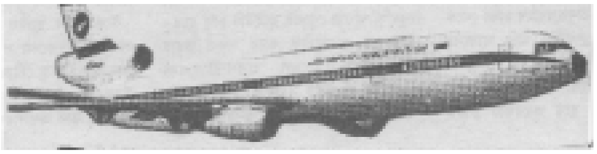

ক্যানাডায় বসবাসরত বাঙালীদের জন্য সুখবর!!

ক্যানাডা এবং আমেরিকার যে কোন শহর থেকে ইউরোপের লন্ডন, প্যারিস, ফ্র্যাংফোর্ট কিংবা রোম হয়ে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা, কোলকাতা ও সিলেটের টিকিট আমরা ইস্যু করে থাকি । নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা বা সিলেটের মতন ভাড়ায় আপনি মন্ট্রিয়ল কিংবা টরন্টো থেকে ঢাকা অথবা সিলেটে ভ্রমণ করতে পারেন ।

Biman BANGLADESH AIRLINES Your home in the sky

এখন ক্যানাডাসহ উত্তর আমেরিকার যে কোন শহর থেকে লন্ডন হয়ে সরাসরি সিলেট যাতায়তের ব্যবস্থা আমরা করে থাকি

জাতীয় এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণ করুন ।

(বিমান অনুমোদিত এজেন্ট)

S.I. TRAVELS

(T.D. BANK BUILDING)
1410 GUY STREET, SUITE 19
MONTREAL, QUEBEC, CANADA, H3H 2L7
Tel : 514-931-4070
Fax : 514-931-1200

TOLL FREE FROM ANY CITY IN CANADA & USA : 1-877-936-1100

মুনীরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপচারিতা *(৪০শ পৃষ্ঠার পর)*

মনিরুল ইসলাম : না না না ঠিক তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি রঙের উৎস এবং রঙের রূপের কথা।

পড়শী : কিন্তু রূপকথার মতো মনে হচ্ছে। ভেসে উঠছে কিছুটা সুরিয়ালিজমের চিত্র। আগুনের রঙ ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু সিদুঁরের রঙ ব্যবহার করা সম্ভব।

মনিরুল ইসলাম : আগুনের রঙকে মনে ধারণ করতে হয় মিয়া, বুঝ না?

পড়শী : তেল রঙ, জল রঙ, মিশ্র মাধ্যম এগুলোকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যবহার করেন।

মনিরুল ইসলাম : ফরিদ কবির এবং নাসরীন জাহানকে গত বছর বলেছিলাম, জল রঙ হচ্ছে কবিতা আর তৈল রঙ হচ্ছে কথাসাহিত্য।

পড়শী : তাহলে মিশ্র-মাধ্যম কী প্রবন্ধ?

মনিরুল ইসলাম : (হেসে) মিশ্র মাধ্যম আর মিশ্র প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ভালো বলতে পারবে।

পড়শী : আপনার ছবিতে কবিতার মতো ব্যাপার-স্যাপার আছে। এক পঙক্তির সাথে অন্য পঙক্তির দূরত্ব দীর্ঘ কিন্তু যোগসূত্র রয়েছে।

মনিরুল ইসলাম : দীর্ঘ কিন্তু যোগসূত্র আছে লক্ষ করে দেখবে। বাইরে কবিতার কারুকাজ থাকলেও ভেতরে আছে মাটি আর মানুষের গল্প।

পড়শী : আপনার ছবি যেন এক একটি অসমাপ্ত গল্প !

মনিরুল ইসলাম : হ্যাঁ, কিছু কিছু ছবিতে ফিনিশিং নেই। তুমি তো কবি। কবিতা লেখ। সব কবিতায় কি সমান্তরাল কিংবা সমান অথবা সমাপ্তির ব্যাপার থাকে?

পড়শী : তা থাকে না। তবে...

মনিরুল ইসলাম : ছবির ক্ষেত্রেও তাই।

পড়শী : ছবি তো সঙ্গীতের মতোই। যেমন সেতার আঙুলের ছোঁয়ায় সুরের প্রাণ পায়। তেমনি দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়লে ছবিও সঙ্গীত হয়ে ওঠে- হৃদয়ের সুর ছড়ায়।

মনিরুল ইসলাম : আসলে সব শিল্পের সাথেই অদৃশ্য এক সাদৃশ্য আছে। সমন্বয় আছে, আছে সহোদর সম্পর্ক।

পড়শী : দেশে এবং বিদেশে কোথায় ছবি এঁকে মজা পান। মনে হয়, আপনার মনে চাঁদপুর আর মননে স্পেন ?

মনিরুল ইসলাম : মেঘনা নদীর পাড়ে চাঁদপুর, এই ধানমণ্ডির লেক, সেই স্পেনের বরফ গলা নদী- সবকিছুই আমার কাছে সমান।

পড়শী : আমাদের দেশের শিল্পী এবং শিল্পকর্ম সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

মনিরুল ইসলাম : আমি ১৯৬৯ সালে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য দেশের বাইরে যাই। তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে, পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুর। আমাদের চিত্রকলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের সম্মান, স্বীকৃতি। এখন আর শিল্পীরা বেকার বসে নেই- ছাত্রাবস্থায় তারা চাকুরি করছে। তাদের চাহিদা প্রচুর। এই অর্জন নিঃসন্দেহে আনন্দের। আমাদের দেশের দর্শক-ক্রেতা, গ্যালারি এবং শিল্প অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন অনেকেই বিশ্বের শিল্পকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এটা খুবই ভালো দিক।

পড়শী : রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

মনিরুল ইসলাম : তিনি তাঁর মতো করে ছবি এঁকেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই বক্তব্য দিয়েছেন; আমি আর কী বলব।

পড়শী : আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস হচ্ছে monir_islam_p@hotmail.com। মনিরুল ইসলামের পরে p কেন?

মনিরুল ইসলাম : আমাদের পদবী 'পাটোয়ারী'। সেই 'পাটোয়ারী'র p-টা ই-মেইলে রেখে দিয়েছি। কারণ, স্পেনে আরো মনিরুল ইসলাম আছে, তাই।

পড়শী : প্রবাসী বাঙালি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

মনিরুল ইসলাম : বাঙালিরা প্রতিভাবান। প্রবাসে তাঁরা তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা ও কৃতিত্বে স্বাক্ষর রাখছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেজন্য আমি গর্ববোধ করি।

পড়শী : সাক্ষাৎকার এবং পড়শীর প্রচ্ছদ এঁকে দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মনিরুল ইসলাম : লালনের আরশী নগরের সেই পড়শী ? চমৎকার! পড়শী নামটা বহুমাত্রিক, অর্থপূর্ণ। প্রবাসীরাও তো এক অর্থে পড়শী। ভালো, বেশ ভালো।

দাদুর চিঠি *(২৯শ পৃষ্ঠার পর)*

হাত লাগালে তৎক্ষনাৎ ফোসকা পড়ে যেত। দুয়েকবার দেখেছি গ্রামের লোকেরা মোনাজাত করছে আল্লার কাছে বৃষ্টির জন্যে, পানির জন্যে। আল্লাহ তাদের মোনাজাত শুনতেন কিনা জানিনা, তবে একদিন সত্যি সত্যি মেঘ করে আসত দক্ষিণ আকাশে। প্রথমে শুধু একফালি সাদা মেঘ। চুপিচুপি উঠে আসছে যেন সমুদ্র থেকে। ক্রমে তার গতি বাড়ছে। সূর্যকে গিলে ফেলছে আস্তে আস্তে। চারদিকে কেমন স্তব্ধ থমথমে ভাব। আমার কাকারা বুঝতে পারলেন কি আসছে। তারা মাঠ থেকে গরু এনে গোয়ালে বাঁধলেন। কাকীরা ফুফুরা সব মুরগীছানাগুলোকে ঢোকালেন ঘরের ভেতরে। বাচ্চাগুলো সব দৌড়ে এল খেলা ছেড়ে। কোন বাচ্চা হয়ত দেরি করছে বলে তার মা চিৎকার করে ডাকতে শুরু করেছেন তাকে। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখতাম। খেলা তো নয় যেন তান্ডব। এই মেঘ বুঝি কোনদিন দেখবে না দাদু এদেশের আকাশে যেন ভেঙেচুড়ে সব খানখান করে ফেলবে। ভয়ানক মূর্তি তার। সমস্ত আকাশকে ঘিরে ফেলেছে সে। সাদা মেঘ প্রথমে হল ছাইয়ের মত কালো, তারপর যেন ঘাসের মত সবুজ, তোলপাড় করছে চারদিকে। তারপরে একটা শব্দ, যেন দূর থেকে হাজার ঘোড়ার সৈন্যবাহিনী আসছে ঢালতলোয়ার নিয়ে। যেন অনেকগুলো ট্রেন আসছে নানাদিক থেকে সড়কের পরোয়া না করেই। গায়ের চামড়াতে সহসা বোধ করি একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা। যেন তীব্র গরমের দিনে এক গ্লাশ ঠান্ডা সরবত এনে দিল কেউ। সাথে সাথে মনে হয় যেন ঘরের চালগুলো সব উড়ে যাবে বাতাসের সঙ্গে। কাঠের খুঁটিগুলো কাঁপছে থরথর করে। বেড়ার দড়িগুলো বুঝি ছিড়ে যাবে এক্ষুণি। আমার ফুফুরা আমাকে জড়িয়ে ধরে দোয়াদরুদ পড়তেন। আমিও পড়তাম ওস্তাদজীর কাছ থেকে শেখা একটা দোয়া। কতক্ষণ যে চলত সেই ভীমের মাতন জানিনা, হয়ত আধঘন্টা, কিন্তু মনে হত যেন অন্তহীন। যেন কেয়ামত এসে গেছে। নূহের সেই বন্যার গল্প শুনতাম ফুফুদের কাছে, মনে হত যেন সেই বন্যা।

অমন করেই আসে বৈশাখ দাদু। ওটাই বাংলাদেশের নববর্ষ। ক্যালেন্ডারের হিসেব রেখেই যেন বঙ্গোপসাগরের ক্রুদ্ধ মেঘ এসে হানা করে আমাদের জীবনে। আমাদের ঘরদোর উড়িয়ে নেয় তার রোষের বাত্যায়। আমাদের তৃষ্ণার্ত পথঘাট খালবিল নদীনালাকে ভরে দেয় তার অবারিত বারিধারায়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে নববর্ষের কার্ড পাঠায়না কেউ, প্রকৃতিই নববর্ষের শুভেচ্ছা নিয়ে আসে মানুষের কাছে। নিসর্গই আমাদের ধারক বাহক প্রতিপালক। তাইতো আমাদের জাতীয় সংগীতের প্রথম দুলাইন হল :

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

দু:খ শুধু এইটুকু যে তোমার প্রাণে কোনদিন এই বাঁশি বাজবে না দাদু।

লেখক পরিচিতি : প্রবীন প্রবাসী ড: মীজান রহমান কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। প্রবাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।

বে এরিয়ার বাংলাদেশীদের সংগঠন BABA

বে-এরিয়াতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, সংক্ষেপে BABA ('বাবা') সিলিকন ভ্যালি তথা বে-এরিয়া অধ্যুষিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের একটি জনপ্রিয় এবং প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময় ধরে BABA প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুস্থ বিনোদন, রুচিশীল সংস্কৃতিচর্চা এবং পেশা ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি প্রবাসীকে একাত্মবোধ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে যুগান্তকারী অবদান রেখে চলেছে।

১৯৮৫ সালে কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ দূরদর্শী প্রবাসীর মহতী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে BABA একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বহু বছর পার হয়েছে, অসংখ্য বাংলাদেশীর আগমন ও বহির্গমন হয়েছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে সিলিকন ভ্যালি ব্যাপক পরিবর্তন ধারন করেছে; কিন্তু বে-এরিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য BABA এখনও অবিতর্কিত প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীয় আসন অক্ষত রেখেছে। এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য আত্মনিবেদিত প্রবাসীর অমূল্য প্ররিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগ।

BABA একটি অরাজনৈতিক এবং অবাণিজ্যিক সংগঠন। এ সংগঠনের মূল লক্ষ্যগুলো হলো - কমিউনিটি কার্যক্রম, বিনোদন, যোগাযোগ-সাধন, সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদি। সিলিকন ভ্যালিতে বাংলাদেশীদের একটি বিশাল ক্রমবর্ধনশীল কমিউনিটি রয়েছে। বিগত ৫-৬ বছরে বাংলাদেশীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সিলিকন ভ্যালিতে কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর ইন্ডাস্ট্রি অধিক তথাপি এখানে সর্বশ্রেণীর এবং সর্বপেশার বাংলাদেশীরা বসবাস করছেন। দীর্ঘ দিন প্রচন্ড পরিশ্রমের পর প্রবাসীরা স্বভাবত:ই কিছুটা অবসর, আমোদ-প্রমোদ আড্ডা এবং বিনোদন প্রত্যাশা করেন। BABA বৃহৎ আঙ্গিকে প্রবাসীদের যোগাযোগ, বিনোদন এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সুযোগ করে দিচ্ছে দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে। পারস্পরিক সৌহার্দবন্ধনের এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে BABA প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে জননন্দিত ও প্রশংসিত।

প্রতি বছরের শুরুতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে এ কমিটিতে সাতজন সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন - ১) সভাপতি, ২) সহ-সভাপতি, ৩) সাধারণ সম্পাদক, ৪) সংস্কৃতি সম্পাদক, ৫) ক্রীড়া সম্পাদক, ৬) কোষাধ্যক্ষ, ৭) গণসংযোগ সম্পাদক। প্রতি বছর ৬-৭টি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে, যেমন, ১) ঈদ পুনর্মিলনী ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, ২) বার্ষিক বনভোজন

বাবা'র একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ও ক্রীড়া দিবস, ৩) বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিবস, ৪) বিশেষ সঙ্গীত সন্ধ্যা, ৫) বার্ষিক নাটক ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানগুলোতে দর্শক উপস্থিতির সংখ্যা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বিগত ৩-৪ বছর যাবত BABA আয়োজিত যে কোন অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ৩০০জন প্রবাসী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলো গুণগত দিক থেকে ক্রমান্বয়ে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রবাসীরা এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উচ্চমানের নিখাদ বিনোদন চর্চার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

প্রতি বছর ১৫০-২০০ জন প্রবাসী এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকেন। মূলত দু'ধরনের সদস্য হওয়া যায় - ১) সাধারণ সদস্য এবং ২) প্রিমিয়াম সদস্য। সংগঠনের আয়ের প্রধান উৎস হল সদস্য চাঁদা। এছাড়া ব্যক্তিগত অনুদান, প্রতিটি অনুষ্ঠানের দর্শনী এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংগঠন তার বার্ষিক কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করে থাকে। BABA প্রতিটি প্রবাসীর এই নি:স্বার্থ প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও BABA মাঝেমাঝে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। মূলত প্রবাসীদের সংগঠন হলও BABA প্রতি বছর বাংলাদেশীদের উন্নয়ন, বন্যা-দুর্যোগ ত্রাণ, প্রযুক্তি বিনিময় এবং সিলিকন ভ্যালি ও সমগ্র আমেরিকাতে বিদ্যমান বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে

THERE IS NO EXPIRATION DATE ON MEMORIES

Bangla Bazar
Will Take You One Step Closer to Home

- 100% Fresh Halal Goat, Beef, Lamb, Chicken
- Frozen Fish From Bangladesh Weekly

BANGLA BAZAR

Bangladeshi, Pakistani, Indian Halal Meat and Grocery Market in SUNNYVALE

(408) 738-3213

924 E. Fremont Ave., Sunnyvale, CA 94087

Tuesday thru Friday : 11.00am to 9.00pm
Sat : 10.00am to 9.30pm
Sunday : 10.00am to 7.30pm

Latest Bengali Movies, Mini Series & Drama For Rent Now

Bengali Aladdin's Sweets Are Available

Cookies, Toast Biscuit, Desi Muri (Puffed Rice), Desi Ghee, Tea, Mustard Oil

Directions : From San Francisco - take 101 South toward San Jose. Exit on Fair Oaks Ave. After crossing Duane stay on left lane to Wolfe road. Stay on Wolfe until you cross El Camino Real, then turn left on Fremont Ave. The store is on your right.
From San Jose - take 101 north toward San Francisco. Exit on Lawrence Expwy and turn left on Lawrence. Turn right on El Camino Real. Turn left on Wolfe Rd. Turn left on Fremont Ave. The store is on your right.

যথোপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য BABA একটি অত্যন্ত কার্যকরী ফান্ড তৈরি করে রেখেছে যেখানে প্রতিনিয়িত অর্থ সংস্থান হচ্ছে।

ক্রীড়া, বিনোদন, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উন্নয়নের BABA-র ভূমিকা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। প্রতিবছরই এ সংগঠন অধিকতর কার্যকর সংগঠন হচ্ছে। বে এরিয়ার বাংলাদেশীদের কাছে BABA-র কোন বিকল্প নেই। আগামীতেও BABA একটি প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশীদের মাঝে এর ব্যাপক প্রসার অব্যাহত রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

টরন্টো থেকে শুভেচ্ছা

যতই বলি না কেন 'বিদেশ', তবুও যে শহরে নীড় বাঁধি সেটাই ক্রমশ: আপন হয়ে ওঠে। একধরনের একাত্মতা গড়ে ওঠে যা ক্রমেই মজবুত হতে থাকে বসবাসের সময় দীর্ঘ হওয়ার সাথে সাথে। তখন আর শহরটিকে 'বিদেশ' মনে হয় না। এমনকি দূরে কোথাও বেড়িয়ে ফেরার সময় 'টরন্টো' শহরের সীমানায় পৌছুলেই যেন বাড়ী ফেরার পুলক জাগে মনে। মনের অগোচরে কিংবা সময়ের খামখেয়ালীতে, টরন্টোই এখন আমাদের অনেকের কাছেই আপন নগরী হিসেবে মনের ভিতর ঠাঁই করে নিয়েছে।

টরন্টো হচ্ছে ক্যানাডার অন্টারিও প্রদেশের রাজধানী। আয়তনের হিসেবে এটি এদেশের সবচেয়ে বড় শহরতো বটেই, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুও। অন্টারিও হ্রদের ধার ঘেঁষে শহরের সব ইমারতের মাথা ছাড়িয়ে আকাশ ছুঁই ছুঁই করে দন্ডায়মান CN Tower উচ্চতায় (১,৮১৫ ফুট) পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এর পাশেই রয়েছে Skydome স্টেডিয়াম যা পৃথিবীতে প্রথম ছাদে ঘেরা স্টেডিয়াম যার গোলাকৃতি ছাদটি পুরোপুরি বন্ধ ও খোলা যায়।

প্রথম কবে এই শহরে বাঙালীর বসবাস গড়ে উঠেছিল তা জানা না গেলেও কথিত আছে যে প্রায় ২০০ বছর আগে অন্টারিও হ্রদের এই পাড় হুরন (HURON) সম্প্রদায়ের কাছে 'টরন্টো' নামে পরিচিত ছিল আর ওদের ভাষায় এই শব্দের অর্থ হোল `Meeting Place' - দেখা-সাক্ষাতের বা মেলামেশার স্থান। ১৭৯৩ সালে বৃটিশ বসতি স্থাপনকারীরা এর নামকরণ করে 'ইয়র্ক' (York)। কিন্তু ১৮৩৪এ পুনরায় 'হুরন' সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত 'টরন্টো' নামটিকেই শহরের নামকরণের জন্য বেছে নেয়। নামের সাথে মিল রেখে টরন্টো বহু-জাতি ও বহু ভাষাভাষীর মিলন-কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠেছে। আজকের টরন্টোর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হোল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের এখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আরএই বহু-জাতির সম্মিলনে 'বাঙালী' হোল নবীন সংযোজন। কর্মঠ ও শান্তিপূর্ণ সম্প্রদ্রায় হিসেবে 'বাঙালী' ইতোমধ্যেই সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষীদের মিলিয়েই এখানকার বাঙালী সম্প্রদায়। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পাঠ্যক্রম চালু করার উল্লেখ করা যায়।

টরন্টোতে সাম্প্রতিককালে সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ সম্মেলন' এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রবাসী বাঙালীদের আয়োজিত 'বঙ্গ সম্মেলন' এই দুই দেশ থেকে আগত বাঙালীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দের প্রতীক হয়ে আছে। আরও একটি জায়গায় বাঙালীদের মাঝে মিল বেশি চোখে পড়ে, তা হোল 'বাংলাদেশী' দোকানে বাংলাদেশের মাছ কিনতে বাঙালী মাত্রেই, তা তিনি বাংলাদেশেরই হন আর পশ্চিমবঙ্গেরই হন, ঠিক হাজির হন। বাংলাদেশের মাছ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম সব্জি-ফল এমনকি মিষ্টিও আজকার টরন্টোর বাংলাদেশী মালিকানাধীন দোকানগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই দোকানগুলি বাঙালী অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকাতে গড়ে উঠেছে গত কয়েক বছর ধরে। টরন্টোর 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' এলাকায় তা বিশেষ করে চোখে পড়ে। শহর কেন্দ্রের কাছাকাছি, এই এলাকায় বাঙালী গ্রোসারী দোকান সহ বিভিন্ন রকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও ইদানিং গড়ে উঠেছে।

দু'টি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশে-বিদেশে' ও 'বাংলা কাগজ' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে টরন্টো থেকে। 'বাংলা জার্নাল' নামে সুধীমহলে সমাদৃত সাহিত্য পত্রিকাটিও টরন্টোরই প্রকাশনা। দেশের গান, নাটক, ইত্যাদির সম্ভারও রয়েছে বাঙালী ভিডিও দোকানে। আর এসবের সুবাদে টরন্টোতেও এখন দেশীয় আমেজ পাওয়া সম্ভব, যা মাত্র ক'বছর আগেও ভাবা যেত না। বাঙালীর এই অগ্রযাত্রা রাজনৈতিক অঙ্গনেও সম্প্রসারিত। ক্যানাডার গত সাধারণ নির্বাচনে এখানকার প্রধান বিরোধী দলের মনোনয়ন পেয়ে বাঙালী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে টরন্টোর একটি আসনে।

ঈদ, পূজা, ক্রিসমাস সহ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য টরন্টোর বাঙালীরা নিজেদের উদ্যোগেই এখন প্রয়োজনীয় আয়োজন করতে পারছে। বাংলা নববর্ষ পালন সহ বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালনে উৎসাহ উদ্দীপনাও উল্লেখযোগ্য। এসবই টরন্টোতে অধিক হারে বাঙালীদের আগমনের প্রত্যক্ষ সুফল।

পুরো উত্তর আমেরিকা জুড়েই বাঙালীর সংখ্যা বাড়ছে, মূলত: নতুনদের আগমনে। পুরনো ও নতুন প্রবাসী এবং বিভিন্ন শহরের পড়শী প্রবাসী বাঙালীদের মাঝে ঐক্য সহযোগিতা ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাও তাই আগের চেয়ে বেড়েছে। যোগাযোগের সেতুবন্ধ রচনায় 'পড়শী' স্বার্থক হোক এই প্রত্যাশা রইলো।

আলী হায়দার

AABEA-SV এর সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানগুলো

গতবছর সিলিকন বাংলা ইনফরমেশন টেকনোলজী (SBIT) কনফারেন্স অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করার পর গত দু'মাসে আরও দু'টি অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে করলো আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট-এর সিলিকন ভ্যালি শাখা (AABEA-SV)।

প্রথমটি ছিল মার্চের ১৬ তারিখের নৈশ ভোজের মাধ্যমে সম্বর্ধনা ও আলোচনা সভা। শতাধিক প্রকৌশলী ও তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় SBIT-2000 এর সংগঠকদের ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড: কায়কোবাদ ও তার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রোগ্রামার দলকে। এ সভায় মূল বক্তব্য পরিবেশন করেন সফল বাংলাদেশী enterpreneur জনাব অলোক দেব। XaQli এবং ভিদিয়া ওয়েব এর প্রতিষ্ঠাতা অলোক দেব নতুন কোম্পানী শুরু করার বিভিন্ন কৌশলের উপর বক্তব্য রেখে বলেন যে এ সময়টি নতুন কোম্পানী শুরুর উপযুক্ত সময়। সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দিয়ে তিনি এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রকৌশল বিশ্বাবিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের অধ্যাপক ড: কায়কোবাদ গত কয়েক বছর বিভাগীয় ছাত্রদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অভাবনীয় কৃতিত্বের চিত্র তুলে ধরেন। এসিএম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে AABEA-SV তাদেরকে প্ল্যাক উপহার দেয়। সভাশেষে সম্বর্ধিত করা হয় SBIT 2000 কনফারেন্সের সংগঠকদের। অত্যন্ত সফল এ কনফারেন্সের অন্যতম সংগঠক মাশুক রহমান পরবর্তী SBIT 2001 সফল করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। সংগঠনের সদস্য এনায়েতুর রহমানের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মুনির আহমেদ ও সেক্রেটারী জিসান খান।

এপ্রিলের ১২ তারিখে AABEA-SV আয়োজন করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর নুরুদ্দিন আহমদের সম্বর্ধনা সভা। স্থানীয় রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত নৈশভোজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রফেসর নুরুদ্দীন আহমেদ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যালীর বিখ্যাত কোম্পানীগুলোতে সাফল্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কার্যক্রম বর্ণনা করে এবং বিভিন্ন ছাত্রদের সাম্প্রতিক কৃতিত্বের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত প্রকৌশলীদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল কর্মশালা দেওয়ার আহ্বান জানান।

AABEA-SV এর সেক্রেটারী জনাব জিসান খান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও ছাত্রবৃত্তি ও ল্যাব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার ব্যাপারে তার সংগঠনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও AABEA-

SV এর মধ্যে একটি যৌথ কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর নুরুদ্দিন আহমেদ দেশে ফিরেই এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

প্রফেসর নুরুদ্দিন আহমেদকে সম্মানিত করে তাকে AABEA এর প্ল্যাক ও কিছু সুভ্যেনির উপহার দেয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলর স্থানীয় প্রকৌশলীদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুভ্যেনির উপহার দেন।

AABEA-SV এর পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব জাহাঙ্গীর দেওয়ান।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
লস এঞ্জেলেস

৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবছর লস এঞ্জেলেস মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলন আগামী ২৬ ও ২৭শে মে, ২০০১ তারিখে (যথাক্রমে শনিবার ও রোববার) লস এঞ্জেলেসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলাসহ উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবী এবং উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে নিবেদিত গুণীজনেরা এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন।

উত্তর আমেরিকায় অভিবাসী বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা থেকে আগত সকল বাঙালীর বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও উপভোগের চাহিদা মেটানো ছাড়াও এই সম্মেলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মের বাঙালী আমেরিকানদের কাছে আমাদের নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তুলে ধরা ও আমাদের মাতৃভূমি তথা বাংলা সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ আগ্রহ শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা। উত্তর আমেরিকায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে বাংলার প্রতি মমতা ও এর সার্বজনীন প্রসারে সর্বোত সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য এর প্রয়োজন ও এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ববোধের তাগিদ আজ এদেশের বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই সম্মেলন এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে উদ্যোক্তারা মনে করছেন।

Bangla Literature and Culture Inc., Chicago, Illinois - এর উদ্যোগে ও এর বিশেষ মূলনীতির ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে প্রথম বারের মত এবং ১৯৯৭ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এর আগে শিকাগো (১৯৯৩, ১৯৯৭, ২০০০), নিউ ইয়র্ক (১৯৯৮) ও ডালাস (১৯৯৯) শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই বাংলার ও উত্তর আমেরিকার অভিবাসী বাঙালী গুণী-গবেষক-সাহিত্যিক-শিল্পীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও অভিবাসী বাঙালী সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগীদের বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সম্মেলনই সার্থকতা লাভ করেছে এবং সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করেছে।

এবারকার এই বর্ণাঢ্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হয়ে আসছেন উত্তর আমেরিকায় অভিবাসীসহ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা থেকে প্রথিতযশা বাঙালী ও বাংলাসেবী সঙ্গীতশিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষক ও পন্ডিতবর্গ। লস এঞ্জেলেস সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে (সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী) :

- সম্প্রতি-নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্র : 'হঠাৎ বৃষ্টি' ও 'আগুনের পরশমণি' (মুক্তধারার সৌজন্যে)
- বাংলা টেলিফিল্ম : 'ট্রানজিট", নাটক, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, একক অভিনয়, নৃত্যনাট্য, মূকাভিনয় ও সঙ্গীতানুষ্ঠান
- নতুন প্রজন্মের আলোচনা ও মতামত ওয়ার্কশপ : বিষয় 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি'
- বৈজ্ঞানিক ওয়ার্কশপ : ইন্টারনেটে-ইমেইলে বাংলা হরফের ব্যবহার - সমস্যা ও সমাধান
- মহিলা বিষয়ক ওয়ার্কশপ : অভিবাসী বাঙালী প্রজন্মে বাংলা সংস্কৃতির বিস্তারে মায়েদের ভূমিকা
- উত্তর আমেরিকায় বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার
- বিপা (নিউ ইয়র্ক)-এর নৃত্যানুষ্ঠান, কাব্য জলসা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো ও ব্যান্ড সঙ্গীত
- বৈশাখী মেলা, বাংলা শিল্পসামগ্রী, বই-ভিডিও-সিডিসহ রকমারী পণ্য ও বাঙালী সুস্বাদু খাবারের বিশেষ স্টল
- শিশু-কিশোরদের জন্য প্লে-গ্রাউন্ড, বাঙালীর আড্ডার জন্য বিশাল মুক্তাঙ্গন, ও অতিথি সমভিব্যহারে আনন্দ ভ্রমণ

সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি ও গুনীজনদের তালিকায় রয়েছেন :

<u>বাংলাদেশ থেকে :</u>

সাহিত্যে কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ, লেখক ইমদাদুল হক মিলন, নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক শফিক রেহমান, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা।

সংস্কৃতিতে বিশ্বনন্দিত যাদুসম্রাট জুয়েল আইচ, কন্ঠশিল্পী বশির আহমদে, চলচ্চিত্র-শিল্পী দম্পতি ইলিয়াস কাঞ্চন ও দিতি, উদীয়মান কন্ঠশিল্পী আঁখি আলমগীর, এবং আরো অনেকে

<u>পশ্চিম বাংলা থেকে :</u>

সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃতিতে নন্দিত কন্ঠশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য

<u>উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে :</u>

ঔপন্যাসিক দিলারা হাশেম (ওয়াশিংটন, ডিসি), কবি সুরাইয়া খানম (অ্যারিজোনা), লেখক আমিনুর রশীদ পিন্টু (নিউ ইয়র্ক), ভয়েস অব আমেরিকার রোকেয়া হায়দার (ওয়াশিংটন ডিসি), আলোকচিত্রশিল্পী আবুল কাজল (নিউ ইয়র্ক), উপস্থাপক আতিকুর রহমান আতিক (ফ্লোরিডা), কন্ঠশিল্পী শাহরিন আবেদীন পিউ (টেক্সাস), ওয়াজিউদ্দীন সাউদ চৌধুরী (ক্যালিফোর্নিয়া) ও কামাল মোস্তফা (ভার্জিনিয়া), নৃত্যশিল্পী আফরোজ ইসলাম (অ্যারিজোনা), বাংলাব্যান্ড দি রেইনস (অ্যারিজোনা), এবং আরো অনেকে

<u>লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে :</u>

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা কাজী মশহুরুল হুদা, সুকন্ঠী গায়িকা মালা গাঙ্গুলী, অভিনেত্রী নায়লা আজাদ নুপুর, কন্ঠশিল্পী এম এ শোয়েব, জহিরুল হক, তুফান, রুনু, আবুল কালাম আজাদ ও অঞ্জলী রায় চৌধুরী, নাট্যশিল্পী মিজান শাহীন ও খাজা মোরতুজ শন্টু, ব্যান্ড বাংলাদেশ ব্যান্ড ও ওপার, এবং আরো অনেকে

সম্মেলনের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে, সম্মেলনে যোগদান, স্যুভেনিরে লেখা-বিজ্ঞাপন, স্টলভাড়া, অনুষ্ঠান পরিবেশনা, সেমিনারের বক্তা, সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুদান প্রদান বিষয়ে আগ্রহী হলে, অথবা বিস্তারিত জানার জন্য সম্মেলন কমিটির কনভেনর ড: ইউনুস রাহীকে ৬২৬-৪৪০-৬৩৪৫ নম্বরে অথবা সচিব কাজী মশহুরুল হুদাকে ২১৩-৯২৫-৪৬৫২ নম্বরে ফোন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলাপচারিতা

এপ্রিলের মাঝামাঝি বে-এরিয়াতে এসেছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহম্মদ। দেখা হলো অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে, কথা হলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলাখুলি। কথা শুরু করেছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের খবর দিয়ে। আমাদের দেশের ছেলেরা ভালো করছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে - এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। প্রবাসী বাংলাদেশীরা জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে তারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। দেশের ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে অধ্যাপক নুরুদ্দীনের সাথে মুখোমুখি সংলাপ -

পড়শী (প) : ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে আপনার কি মতামত?

অধ্যাপক নুরুদ্দীন আহম্মদ (নু) : ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং ছয় দফা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রছাত্রীদের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। সুতরাং রাজনীতি সচেতন হওয়া সব ছাত্রছাত্রীদেরই দরকার। কিন্তু আমরা আমাদের দেশ পেয়েছি, নিজেদের ভাষা পেয়েছি। এখন আমাদের দেশ ও জাতি গড়ার পালা। নিজেদের গড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া দরকার। যে রাজনীতি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের গড়ার বদলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তা থেকে যেন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দূরে থাকে।

প : শুধু ছাত্রসমাজই নয়, অনেকক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনৈতিক দলের নাম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে অংশ নেন। এর প্রয়োজনীয়তা কিংবা তাৎপর্য কি?

নু : আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা নাই। শিক্ষকরা নিজেরা দলগুলোর সাথে যুক্ত থাকলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি। অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যই মুখ্য হয়ে দেখা দিতে পারে। আমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সবসময় মেধানুসারে শিক্ষক নিয়ে থাকি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটে নির্বাচন হয়, ডীনদের নির্বাচন হয় এবং উপাচার্য নির্বাচনের মাধ্যমে হন, দেখা গেছে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এ নির্বাচনগুলো দলভিত্তিক হয়ে যায়।

প : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক আছে? তা না হলে শিক্ষকতায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন?

নু : কিছু কিছু বিভাগে আমাদের শিক্ষকের প্রয়োজন। আবার একটি বিভাগে ৫০-এর অধিক পি.এইচ.ডি. করা শিক্ষক আছেন, যা কিনা বিদেশের অনেক স্কুলের অনেক বিভাগে নেই। প্রবাসী বাংলাদেশীরা সবসময়ই আমাদের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে পারেন নানাভাবে। প্রবাসীরা বাংলাদেশে এসে সেমিনার, শর্ট-কোর্স, কর্মশালা দিতে পারেন। সেমিনার, শর্ট-কোর্স এবং কর্মশালায় আগ্রহী প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। স্যাবাটিক্যালে কেউ এক টার্ম পড়াতে চাইলেও যোগাযোগ করতে পারেন। এসমস্ত ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ স্বল্প পরিমাণ সম্মানী প্রদানের চেষ্টা করে থাকি। আমি বুয়েটে ফিরে গিয়ে, বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্ররা যাতে সহজেই যোগাযোগ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবো।

প : বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্থান করে নিচ্ছে বলে মনে হয়। এর একটা কারণ হতে পারে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগলোতে বছরের পর বছর নষ্ট হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত?

উপাচার্য অধ্যাপক ড: নুরুদ্দীন আহম্মদ

নু : আমার মনে হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুবই দরকার আমাদের দেশের জন্য। ছাত্রছাত্রীদের যতটুকু সম্ভব সুযোগ দেওয়া যায় পড়াশোনা করার জন্য ততই ভালো। আমরা বুয়েটে সারাদেশ থেকে মাত্র ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করি প্রতি বছর। বাকীদের পড়াশোনার সুযোগ না দিলে, অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমাবে পড়াশোনার জন্য। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ দেয় ছাত্রছাত্রীদের। তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকা দরকার এবং নিজস্ব শিক্ষকও (কমপক্ষে ৫০%)। একটা বিল্ডিং ভাড়া করে কিংবা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির উপরে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে কতটুকু পরিবেশ আমরা দিতে পারবো সেটা ভাবা দরকার।

প: ওয়েব-সাইট আজকাল যে কোন প্রতিষ্ঠানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ গণযোগাযোগ মাধ্যম। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের ওয়েব-সাইট তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষনের মত পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকাটাই স্বাভাবিক। তারপরও ওয়েব-সাইট মানসম্মত নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত?

নু : বুয়েটের ওয়েব-সাইটটা যাতে সুন্দর এবং তথ্যবহুল হয় এ ব্যাপারে আমি দেশে গিয়ে কাজ করবো। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে। আশা করছি নতুন ওয়েব পেইজ বুয়েটকে সঠিকভাবে তুলে ধরবে সারাবিশ্বের কাছে।

প : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় খুব ভালো করছে। এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

নু : এটা খুবই ভালো কথা আমাদের ছেলেরা ভালো করছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। শুধু তাই নয়, আমাদের এক ছাত্রকে পাশ করার আগেই মাইক্রোসফট চাকুরির অফার দিয়েছে, যা কিনা আমাদের জন্য খুবই গর্বের কথা। আমেরিকার এম.আই.টি., বার্কলে, স্ট্যানফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের ছাত্ররা ভর্তি হতে পারছে। দেশে ও বিদেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন আরো ভালো করে সেটাই কামনা করছি সবসময়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মো: জাফর উল্লাহ

জেগেছে বাঙালীর ঘরে ঘরে
একি মাতম দোলা
লেগেছে সুরের-ই তালে তালে
হৃদয় মাতম দোলা

মেলায় যাইরে-
বাসন্তি রঙ শাড়ী পড়ে
ললনারা হেটে যায়-

ই-মেলা

http://e-Mela.com

আমাদের ঠিকানা

TAJ TRAVEL INTERNATIONAL

Corporate ❑ Apex ❑ Excursion ❑ Domestic ❑ International ❑ Cruise ❑ Packages ❑ Hotel & Rent a Car etc

আমরা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং বিশ্বের যে কোন শহরে ভ্রমণের জন্য **Singapore / Thai air / Malaysian / Korean / Eva air / Cathay Pacific + Dragon / United / Biman / Gulf air / Emirates / British air** এবং আর সকল বিমানের নির্ভরযোগ্য টিকিটের ব্যবস্থা সাথে, পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ সমাপনের জন্য শুধু টিকিট অথবা পুরো প্যাকেজ তৈরী করা এবং আমেরিকার যে কোন শহর থেকে শহরে কম সময়ের নোটিশে কম দামে টিকিট করে দিতে সক্ষম। আমরা বে-এরিয়াতে আপনাদের ভ্রমণে সবরকম সহায়তায় একমাত্র বাংলাদেশী বিশ্বস্থ ও নির্ভরশীল ট্র্যাভেল এজেন্ট হিসাবে গত ১৯ বছর ধরে পরিচিত।

"Experience Travel with a Difference"

Mon - Fri from 9.30am to 7.30 pm & Sat 11.00am to 1.00pm

Please contact for the LOWEST Fares

Mohammad (Mowla) **Baksh**
E-mail : Tajtravelint@hotmail.com

Ph : 510-770-0422
Fax : 510-770-09655

41994 Miranda Street, Freemont, CA 94539

ক্রিকেটে যে প্রশ্নের সহজ উত্তর মেলে না!

দুলাল মাহমুদ

ক্রিকেট থেকে দূরে সরে থাকতে চাইলেও উপায় নেই। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই ক্রিকেট। বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা যায়, 'ইট ক্রিকেট, স্লিপ ক্রিকেট'। ক্রিকেটের আনন্দযজ্ঞে সবারই কম-বেশি নিমন্ত্রণ। সেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ক্রিকেট এই নেটিভদের দেশে এলেও হালে ক্রিকেট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ক্রিকেটের যে ক্রেজ সৃষ্টি হয়, বিশ্বকাপ খেলার পর তা রূপ নেয় উন্মাদনায়। এমনিতেই নাচনেওয়ালী তারপরে ঢোলের বাড়ি দিচ্ছে ইলেকট্রোনিক্স মিডিয়া। এখন সাংবাৎসরিক ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। যে ক্রিকেট শীতের মিঠে রোদে মাঠে বসে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার কথা, তা পৌঁচেছে বাড়ির হেঁসেল অবধি। বাধ্য হয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় ক্রিকেটে। ক্রিকেটের আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ায় মনের মাঝে অনবরত ঘুরপাক খায় ক্রিকেট।

ক্রিকেটের 'আনন্দময় কোলাহলে' এই অধম খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। নিজেকে অনেকটা অনাহুত মনে হয়। পেশাগত কারণে ক্রিকেটের আলো-হাওয়া গায়ে লাগালেও তার উত্তাপ-উত্তেজনা তেমনভাবে টের পাই না। এমনিতেই বিদ্যা-বুদ্ধির যা জোর, তাতে দুয়ে দুয়ে চার বুঝি। এর এদিক-সেদিক হলেই দিশেহারা হয়ে যাই। বাঙালি হয়েও আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করতে পারিনি, অন্য ভাষা তো দূরে থাক। সেখানে কিকেটকে মনে হয় হিব্রু ভাষা। অবশ্য ক্রিকেটের গভীরে মাথা না গলালে শাদা চোখে 'ক্রিকেটীয় রূপ-মাধুর্যে' মুগ্ধ হওয়া যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অধিকাংশ ক্রিকেট অনুরাগী ফুলের সৌরভটুকুই নিয়ে থাকেন, অনর্থক কাঁটা খোঁজার চেষ্টা করেন না।

আমার কথা হলো, যে খেলাটির জন্য জীবনের অনেক মূল্যবান সময় রোদে-বৃষ্টিতে কাটিয়ে দিতে হচ্ছে, তার মর্মই যদি কিছুটা বুঝতে পারলাম না, তাহলে কেন ক্রিকেটের পিছনে এই ছুটে চলা? যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কেউ কি দিব্যি দিয়েছে ক্রিকেট নিয়ে মাথা ঘামানোর? তা অবশ্য দেয়নি। কখনো মাথা ঘামাতেও চাইনি। এ কথা নির্দ্বিধায় কবুল করে নিতে চাই, ক্রিকেট লিখিয়েরা কাঠের বলটিকে 'স্বর্গীয় আপেল' হিসেবে যতই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোন না কেন, এই বলের ভয়ে জীবনে কখনো ক্রিকেট মাঠের সঙ্গে মিতালি পাতাই নি। অঙ্কের হিসাব মিলাতে না পারায় যে আমি অসংখ্যবার পরীক্ষায় ডাব্বা মেরেছি, সেই আমি অঙ্কের চেয়ে 'জটিল' ক্রিকেটেই বা মন-প্রাণ সঁপে দেব কোন দু:খে? কেউ কি জেনে শুনে বিষ পান করতে পারে?

কিন্তু ঘটনাচক্রে ক্রিকেটকে এড়িয়ে জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ কারণেই ক্রিকেট একটু-আধটু বুঝতে চাওয়ার ভিমরতি। এ জীবনে একটি প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পেলাম না। নির্দোষ এ প্রশ্নটি হলো : ডিম আগে না মুরগি আগে? এ নিয়ে ভেবে চিন্তেও কুল-কিনারা করে উঠতে পারিনি। বাধ্য হয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় ক্ষান্তি দিয়েছি। তেমনিভাবে ইদানিং ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে যেয়ে অনেক সহজ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। দেখি, আপনারা পাবেন কিনা?

আচ্ছা, আপনারা কি কেউ বলতে পারেন, ক্রিকেটে এক বলে সর্বোচ্চ কত রান হয়? আপাত নিরীহ এই প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলবেন, এই সহজ-সরল প্রশ্নের উত্তর যে জানে না, তাকে কান ধরে ক্রিকেট মাঠ থেকে বের করে দেয়া উচিত। যারা একটু সহনশীল তারা যা হোক একটা কিছু উত্তর দিয়ে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করবেন। অথচ ক্রিকেট যাদের ঘর-সংসার, সেইসব ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়ে এর কোন সঠিক উত্তর খুঁজে পাইনি। কেউ যদি এর যথাযথ উত্তর দিতে পারেন আমি তার গোলাম গয়ে থাকবো।

এমন একটি সাধারণ প্রশ্নের যদি সঠিক উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে হাজারো প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারছে তার বেলায় কি হবে? আসলে ক্রিকেট এমন একটি খেলা, যার পরতে পরতে মাকড়শার জালের মত জটিলতা ছড়ানো। আমরা জানি, ছয় বলে এক ওভার। এই জানাটা কি আদৌ ঠিক? বোলার যদি একের পর এক নো কিংবা ওয়াইড বল করতে থাকেন, তাহলে কত বলে ওভার শেষ হবে? এটা কি কারো পক্ষে আগাম বলা সম্ভব?

একটি দল হেসে খেলে ব্যাটিং করলো ৫০ ওভার। প্রতিপক্ষ দলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অন্য কোন কারণে কার্টেল ওভার ব্যাট করতে হলো। দ্বিতীয় দলকে হয়তো বলা হলো ২৫ ওভার ব্যাট করার জন্য। মনে হতে পারে, প্রথম দল প্রথম ২৫ ওভারে যে রান করেছে কিংবা মোট রানকে ৫০ ওভারে ভাগ দিয়ে ওভার প্রতি রানকে ২৫ দিয়ে গুণ করে যা হবে, দ্বিতীয় দলকে তাই করতে হবে। অঙ্কের এই সরল নিয়মে তো আর ক্রিকেট হতে পারে না। তাই প্রবর্তন করা হয়েছে ডাকওয়ার্থ/লুইস মেথড। দক্ষ পরিসংখ্যানবিদ না হলে কারো সাধ্যি নেই এটা বোঝার। কত দলকে যে এ কারণে বলি হতে হলো! এর চমৎকার উদাহরণ ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট। সিডনিতে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বৃষ্টির কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে টার্গেট দেয়া হলো এক বলে ২২ রান করার। যা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তব ও অযৌক্তিক। যেহেতু খেলাটির নাম ক্রিকেট, তাই কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

একদিনের ক্রিকেটে যারা প্রথমে ফিল্ডিং করে, তাদের ২১০ মিনিটে ৫০ ওভার শেষ করতে হবে। নতুবা সময় অনুপাতে ওভার কাটা যাবে। যেমনটি সপ্তম এশীয় কাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলায় ভারতের দু'ওভার কাটা যায়। এটা না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু পরে যারা ফিল্ডিং করবে, তারা যদি নির্ধারিত সময় ৫০ ওভার করতে না পারে, সেক্ষেত্রে কি হবে? উত্তর, অর্থকরী জরিমানা। এটা কি

কোন যৌক্তিক বিচার হলো?

স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে বল শুন্যে উঠলো। সেই বল ক্যাচ ধরার জন্য ফিল্ডার ছুটে এলে নন-স্ট্রাইকার ধাক্কা দিলে ফিল্ডার ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হলেন। এ জন্য দায়ী কে? অবশ্যই নন-স্ট্রাইকার। অথচ এক্ষেত্রে বলির পাঠা হবেন স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান। একি কোন ন্যায্য বিচার?

কোন ফিল্ডার ব্যাটসম্যানকে আউট করতে যেয়ে বল ছুঁড়ে মারলে তা মাটি ঘেঁষে সীমানার বাইরে গেলে চার হয়। তাই যদি হবে, একইভাবে ব্যাটসম্যানকে আউট করতে যেয়ে ফিল্ডার বল শুন্যে সীমানা অতিক্রম করালে সেটিও ছক্কা না হয়ে চার হবে সেন? এর কোন উত্তর নেই।

ব্যাট করার সময় ব্যাট কিংবা পা স্ট্যাম্পে লাগলে এমনকি ক্যাপ বা হেলমেট খুলে উইকেটে পড়লে হিট উইকেট হয়। কিন্তু রান নেয়ার সময় ব্যাট হাত থেকে ছুটে স্ট্যাম্পে লাগলে ব্যাটসম্যান কেন আউট হবেন না?

জানি, বোকার মত প্রশ্ন। তবুও জানতে ইচ্ছা করে, ১০০ রানেই যদি একটি সেঞ্চুরি, তবে এক সঙ্গে ৫০০ রান করলে পাঁচটি সেঞ্চুরি নয় কেন?

'মেডেন ওভার'-এর বাংলা করলে দাঁড়ায় 'কুমারী ওভার'। ক্রিকেটের পরিভাষায় কোন রান না হওয়াকে মেডেন ওভার বলা হয়। কিন্তু লেগ বাই বা বাই রান হলেও ওভার কীভাবে মেডেন হয়? তাহলে লেগ বাই বা বাই রান কি বয় ফ্রেন্ড?

ওয়েস্ট উন্ডিজ সফরে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানী স্পীনার মুশতাক আহমদের একটি বল ঘূর্ণি খেয়ে স্ট্যাম্পে আঘাত করলে একটি বেল লাফিয়ে ওঠে আবার স্ট্যাম্পে বসে। আমার মত যারা আনাড়ী তারা ধরে নেবেন এটা আউট। কিন্তু কিকেটের আইনে বেল যদি আকাশ ঘুড়ির মত উড়ে উড়ে আবার এসে স্ট্যাম্পের উপর ঠাঁই করে নেয়, তাহলেও নাকি আউট নয়। এমনকি বল যদি দুই স্ট্যাম্পের মাঝ দিয়ে যায়, তাতেও আউট হওয়ার বিধান নেই। কি বিচিত্র নিয়ম। তাও তো 'লস্ট বল' নামে একটি আইন আছে। এই আইন প্রবর্তনের আগে ব্যাটের আঘাতে বল গাছের মগডালে আটকালে কিংবা বল কোনো পুকুরে পড়লে বল মাঠে না আসা পর্যন্ত ব্যাটসম্যানরা রান নিতে পারতেন। রক্ষে, না হলে দর্শকদের মাঠে বিছানাপাটি নিয়ে যেতে হত।

একজন বোলার এক হাতে বল করার পর অন্য হাতে বল করতে চাইলে তার সেই স্বাধীনতাও নেই। এ জন্য আম্পায়ারের অনুমতি নিতে হবে। অনুরূপভাবে ব্যাটসম্যান হাত বদল করতে চাইলে বিপক্ষদলের অধিনায়কের অনুমতি চাইতে হবে। এটা কি কোন কথা হলো?

টেস্ট ক্রিকেটে কোন দল যদি ব্যাট করতে নেমে মনে করে, তারা প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে দেবে না, সেটা ইচ্ছে করলেই তারা পারে। তাদের ব্যাটসম্যানরা টানা পাঁচদিন ব্যাট করলে প্রতিপক্ষ দল ব্যাট করার সুযোগই পাবে না। একদিনের ক্রিকেটে ফিল্ডিং করতে যেয়ে এক বা একাধিক ফিল্ডার আহত কিংবা অসুস্থ হলে, তার বিকল্প কেউ ব্যাট করতে পারবেন না। এমনকি প্রতিপক্ষ অধিনায়ক যদি অনুমোদন না দেন, তাহলে বিকল্প ফিল্ডারও মাঠে নামানো যাবে না। ফুটবলে লাল কার্ড পেলে যেমন কম খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হয়, ক্রিকেটেও তেমনটি করতে হবে। এটা ভদ্রলোকের খেলা হলো?

ব্যাটসম্যান রান নেয়ার সময় ফিল্ডার যদি উইকেট ভেঙ্গে ফেলেন অর্থাৎ টুকরো টুকরো করেন এবং ভাঙ্গার আগে বাটসম্যান পপিং ক্রিজের মধ্যে পৌঁছে যান, তখন ভাঙ্গা উইকেট দেখে ব্যাটসম্যান আবার রান নেয়া শুরু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাকে আউট করতে হলে বল দিয়ে ভাঙ্গা স্ট্যাম্পে এমন জোরে মারতে হবে, যাতে ঐ স্ট্যাম্প মাটি থেকে উপড়ে গিয়ে মাঠে পড়ে কিংবা বল ধরা হাতে যে কোন স্ট্যাম্প মাটি থেকে তুলে ফেলতে হবে কিংবা সব কটি স্ট্যাম্প যদি মাঠে পড়ে থাকে, তাহলে যে কোন একটি স্ট্যাম্পকে পুন:স্থাপন করে তারপর তা ভাঙ্গতে (ভূমিচ্যুত) হবে। এটা অনেকটা মাস্তানি করার মত ব্যাপার নয় কি?

ব্যাট সাধারণত দু'জনেই করেন। কিন্তু অনেক সময় ব্যাটিং পক্ষের চারজন একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারবেন। দুই ব্যাটসম্যান যদি দৌঁড়তে অক্ষম হন, তাহলে তারা দু'জনেই রানার নিতে পারবেন। রানার থাকাবস্থায় ব্যাটসম্যান রান নেয়ার জন্য পপিং ক্রিজের বাইরে গেলে ফিল্ডার স্ট্যাম্প ভেঙ্গে দিলে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবেন। তাহলে কি রানার মাঠে থেকে যাওয়ার কথা নয়?

কোন উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ফিল্ডিং করার সময় ১৫ মিনিটের বেশি মাঠের বাইরে থাকলে তিনি তার দলের হয়ে খেলা শুরুর ২০ মিনিট পর্যন্ত ব্যাট করতে পারবেন না। তবে এ সময়ের মধ্যে যদি দলের পাঁচ উইকেটের পতন ঘটে, তাহলে ব্যাট করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন বোলার ১৫ মিনিটের উপরে যতক্ষণ বাইরে থাকবেন, মাঠে এসে ততক্ষণ বল করতে পারবেন না। এটা কি মাঠ ত্যাগ করার শাস্তি?

ফুটবলে গোলরক্ষকের পরিবর্তে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে আরেকজন গোলরক্ষক নামতে পারেন। কিন্তু ক্রিকেটে বিকল্প উইকেট রক্ষকের নামানোর সুযোগ নেই। খেলা পরিত্যক্ত হলে ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত খাতায় লাভ-লোকসান যোগ হলেও দেশ বা ক্লাবের খাত শূন্য থেকে যায়। কি অদ্ভুত নিয়ম!

ক্রিকেট এমন একটি খেলা, যাতে বিচিত্র রেকর্ডের সমাহার। ভাল কিছু করলেও রেকর্ড। মন্দ কিছু করলেও রেকর্ড। কোনো ব্যাটসম্যান রান না করতে পারলে কিংবা কোন বোলার উইকেট নিতে না পারলেও রেকর্ডের পাতায় স্থান পাবেন। যেমন টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটধারী ক্যারিবীয় বোলার কোর্টনি ওয়ালশ ব্যাটসম্যান হিসেবেও রেকর্ড করেছেন। তিনি সর্বাধিকবার শূন্য রানে উইট হয়েছেন। এটাও রেকর্ড!

(১২শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

'স্পেনে আমার বিকাশ হলেও মূল শেকড় চাঁদপুরে'

প্রচ্ছদশিল্পী মুনীরুল ইসলামের সাথে আলাপচারিতা

ষাট দশকের শেষার্ধে দৃপ্ত পদচারণায় বাংলাদেশের শিল্পকলাঙ্গনে, সৃজনশীল শিল্পকর্মের জগতে প্রবেশ করেছিলেন মনিরুল ইসলাম।

তিন দশকের অধিক সময় ধরে স্পেনের মাদ্রিদে প্রবাসী শিল্পী মনিরুল ইসলামের পরিচিতি একজন অত্যন্ত গুণী, সৃজনশিল্পী হিসেবে; মূলত এক নামে যিনি পরিচিত হয়েছেন 'প্রিন্ট মেকার' হিসেবে। নিজের কাজের পাশাপাশি সেখানকার স্থানীয় শিল্পীদের কাছেও তিনি আস্থাবাজন একজন পরিচ্ছন্ন ছাপচিত্রী। কিন্তু তাঁর কাজ ছাপচিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে সীমানা অতিক্রম করে তিনি চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'মনিরুল ইসলাম হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে শিল্পীদের শিল্পী'। এমন একটি পরিশীলিত শৈল্পিক মেজাজ এবং সৃজনশীল বৈদগ্ধ তিনি অর্জন করেছেন যা একদিকে তাঁকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত করেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতার নিরিখে তাঁর বলিষ্ঠ শিল্পীসত্ত্বার পরিচয়টিও সুস্পষ্ট করেছে অনায়াসে।

স্পেনের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের তালিকায় তাঁর নাম অন্ত র্ভুক্ত। তিনি একুশে পদকসহ দেশ-বিদেশের প্রচুর আন্তর্জাতিক পুরস্কার, সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। সর্বশেষ স্পেনের জাতীয় পুরস্কার 'প্রেমিয় ন্যাশনাল ডে গ্রাবাদো' ৯৭ এবং কায়রোর 'আর্টিস্ট অনার অব দি ট্রিনাল' ৯৯ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। দেশ-বিদেশে তাঁর অনেক প্রদর্শনী হয়েছে। তাঁর ছবি বিশ্বের বিভিন্ন গ্যালারি ও বিভিন্ন ব্যক্তির সংগ্রহে রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের এক গর্বিত সন্তান। তাঁর স্ত্রী মেলা ফেরারও একজন খ্যাতিমান শিল্পী।

প্রবাসী মনিরুল ইসলাম সময় সুযোগ পেলেই চলে আসেন মাতৃভূমিতে। বর্তমানে তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন। ছবি আঁকছেন। তাঁর ধানমণ্ডিস্থ ফ্ল্যাটে পড়শীর পক্ষ থেকে একটি ঘরোয়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল।

পড়শী : আপনার ছবি বিমূর্ত। এই বিমূর্ততা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

মনিরুল ইসলাম : বিমূর্ত ঠিকই কিন্তু ইমেজ বিমূর্ত নয়; জীবন্ত, সতেজ-সজীব। হয়তো সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না, তাই বিষয়-আশায় অনুবাদ করে নিতে হয়। আর সে অনুবাদ হৃদয়ের অনুবাদ।

পড়শী : তাহলে দেখা এবং উপলব্ধির ব্যাপারটি অনুবাদের মতোই। আপনার ছবি বিমূর্ত হলেও চমৎকার, মুগ্ধ করে।

মনিরুল ইসলাম : ঐখানেই তো মজা। ছবি তো আর বুঝবার বিষয় নয়; চিন্তার বিষয়, ভালো লাগার বিষয়...

পড়শী : আপনি একের পর এক বৃত্ত ভেঙে ভিন্ন মাত্রায় দ্রুত রঙ, রেখা, আকার, প্রেক্ষাপট প্রভৃতি পাল্টান। কেন?

মনিরুল ইসলাম : স্থির বা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তাই নতুন দিগন্তের দিকে ধাবিত হতে হয়। 'নতুন দিগন্ত' বলতে আমি নতুন ক্ষেত্রে বুঝাতে চাইছি, এক সুন্দর থেকে আরেক সুন্দরের দিকে যাত্রা।

পড়শী : এই যাত্রাটাই শিল্পের ক্ষেত্রের নতুন মাত্রা সৃষ্টি করছে। তাই চাঁদপুর থেকে ছুটে যান স্পেনে?

মনিরুল ইসলাম : চাঁদপুর আর স্পেনের যোগসূত্র বা উপমা উদাহরণটি এখানে খাটে না।

পড়শী : সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে আপনি দেশীয় রঙ ব্যবহার করেছেন এবং নতুন

ডাইমেনশন এনেছেন।

মনিরুল ইসলাম : বিদেশী দামি রঙগুলো বিভিন্ন কেমিক্যালে তৈরি। কিন্তু আমাদের দেশের এটেল মাটি, পোড়া মাটি, ডিমের খোসা, ছাই কালি, কাপড়ে দেয়া নীল, রেড অক্সাইড প্রভৃতি আদি এবং অকৃত্রিম রঙ। আমি এই সব খাঁটি রঙ ব্যবহার করেছি। যার আবেদন এবং স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

পড়শী : আবার পাট, শোলা, তালপাতা, বিভিন্ন ফলমূলের বীজ, কুড়ি, ঝরা পাতা, সেদ্ধ চালের আঠা ও আটা, ডাল, খড়কুটো, নিউজপ্রিন্টও ব্যবহার করেছেন।

মনিরুল ইসলাম : হ্যাঁ, কিছু কিছু দেশীয় উপকরণও আমার শিল্পকর্মের প্রয়োজনে এবং প্রাসঙ্গিকতায় অনিবার্যভাবে ক্যানভাসের রঙ-রেখার সাথে মিলে-মিশে একাত্ব হয়ে গেছে। আকাশ, আগুন, মাটি, প্রকৃতি প্রভৃতিই হচ্ছে রঙের রাজা। আকাশের নীল, প্রকৃতির সবুজ, আগুনের লাল, মাটির ধূসরতাকে ধারণ করে মনের মাধুরী আর হৃদয়ের রঙ মিশিয়ে আমি ছবি আঁকতে চাই। সেতু তৈরি করতে চাই প্রকৃতির সাথে, অতীত আর ভবিষ্যতের সাথে, বাস্তব আর অবাস্তবের সাথে----

পড়শী : সালভাদর দালির সেই পরাবাস্তব ঘড়ির বিষয়টি মনে পড়ছে।

(৩১শ পৃষ্ঠায় দেখুন)